Vol. 32 | No. 3 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নাজীব মা ও আরবী কথা - সাহিত্য

Volume	32
Issue	3
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ আৰু বকর সিদ্দীক
Published online	June 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v32i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i3.8
Pages	151-216
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নাজীব মাহ্‌ফুয ও আরবী কথা-সাহিত্য

মোঃ আবু বকর সিদ্দীক

হিজরী ২য় (খ্রীস্টাব্দ অষ্টম) ও হিজরী ৩য় (খ্রীস্টাব্দ নবম) শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আব্বাসী খলীফা আল-মামূনের রাজদরবারে বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিদের আবির্ভাব আরবী শিল্প ও সাহিত্যে এক গৌরবময় দিক সূচিত করে। এই সময় রম্য সাহিত্যকে কেন্দ্র করে আরবী গদ্যরীতিতে এক নব পর্যায়ের উন্মেষ ঘটে। প্রাচীনকালে ব্যাকরণ-শাস্ত্র, বাগ্মিতা ও কাব্যকলাকেই রম্য রচনা বলা হতো। পরবর্তীকালে Belles-Letters (রম্য রচনা) বলতে কল্পনা-কান্ত ও শিল্পসঙ্গত যে-কোন সাহিত্যকেই বুঝানো হতো এবং প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্যও রম্য রচনার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হতো। কিন্তু আধুনিক কালে আরবী রম্যরচনা বলতে এক শ্রেণীর লঘু কল্পনাময় হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ (মাকালা)-কে বুঝায়। আরবী রম্যসাহিত্যের প্রথম নায়ক ইব্‌ন আল-মুকাফফা (মৃ. ১৪৩/৭৬০)। তাঁর রচিত 'কালীলা ওয়া দিমনা'[১] (দুইটি শিয়ালের নাম) আরবী কথা-সাহিত্যের প্রথম পদক্ষেপ। এরপর ইব্‌ন কুতায়বা (মৃ. ২৭৬/৮৮৯), আল জাহিয (মৃ. ২৫৪/৮৬৮), ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহ্‌ (মৃ. ৩২৯/৯৪০), ইমাদ আল-দীন আল-কাতিব আল-ইসফাহানী (মৃ. ৫৯৭/১২০০) প্রমুখ পণ্ডিতব্যক্তি রম্য-সাহিত্য-কেন্দ্রিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁদের যথাক্রমে লিখিত 'উয়ূন আল-আখবার' (খবরের উৎস), 'কিতাব আল-হায়াওয়ান' (প্রাণী জগতের গ্রন্থ), 'আল-ইক্‌দ আল-ফরীদ' (মূল্যবান মুক্তা) ও 'খারীদাত আল-কাস্‌র' (প্রাসাদের কুমারী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি প্রেম, ভালবাসা, সাহসিকতা এবং অভিমানের রসসিক্ত মিশ্রণে কাহিনীগুলো পরিপূর্ণ। এইসব কাহিনীর বর্ণনায় অনেক ক্ষেত্রে হাদীসের প্রারম্ভিক রীতির অনুসরণ করা হয় এবং নীতি-কথা ও উপদেশমূলক বাক্যের মাধ্যমে শেষ হয়। গল্পবলার মধ্যে

সহজ সরল রীতি প্রায়ই অনুপস্থিত। ঘোরালো ভঙ্গী-সঙ্গাত বক্তব্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি অনেক পাঠকের পক্ষেই বোধগম্য নয়। ৪র্থ। দশম শতাব্দীতে আরবী গদ্য রীতির আরো উন্নতি সাধিত হয়। আরবী কথা-সাহিত্যের এই নব রূপায়ণে সর্ব প্রথম আত্মনিয়োগ করেন বদী আল-যামান আল-হামাদানী (মৃ. ৩৯৮/১০০৭) এবং পরে আল-হারীরী (মৃ. ৫১৬/১১২২) তাঁদের স্ব স্ব মাকামাত রচনার মাধ্যমে। মাকামাতের আভিধানিক অর্থ বৈঠক। সাহিত্য-বৈঠকের মাধ্যমে লেখক তাঁর রচনা পড়ে শুনাতেন এবং প্রত্যেকটি রচনা স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি ছোটগল্প। গল্পগুলোর বিষয়বস্তু সামাজিক জীবনের হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, দুঃখ-দুর্দশা এবং সাহস-দুঃসাহস ইত্যাদির সমন্বয়ে নির্বাচন করা হতো। এমন কি কোন-কোন গল্পে বিদ্রূপাত্মক মনোভাবও স্পষ্ট।

একই শতাব্দীর আরবী গদ্য-সাহিত্যের আরো একটি উল্লেখযোগ্য অবদান 'আল্‌ফ লায়লা ওয়া লায়লা' (একহাজার এক রজনী), যা আরব্য রজনী বা উপন্যাস নামে খ্যাত। আরব্য রজনীর গল্পসমূহও প্রেম-বিরহ, সাহসিকতা, অভিযান, দয়া-দাক্ষিণ্য, মহানুভবতাও উপদেশ-ধর্মিতার এক একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। দ্বাদশ/অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরবী-গদ্যরীতি এই একই খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। ১২১৩/১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মিসর অভিযানের পর থেকেই আরবী সাহিত্যের রূপান্তর আরম্ভ হয় এবং এই রূপান্তর আরবী কথা-সাহিত্যেও সমভাবে প্রযোজ্য।[২]

আধুনিক আরবী কথা-সাহিত্য তথা উপন্যাস ও ছোটগল্প প্রকৃত অর্থে সনাতন রীতির আরবী সাহিত্যের একটি অভিব্যক্তি নয়। মূলতঃ ত্রয়োদশ/ঊনবিংশ শতাব্দীই আধুনিক আরবী সাহিত্যের সূচনাকাল, যাকে আরবী ভাষায় আল-নাহদা, আল-ইনবিআস (নব জাগরণ) বা রেনেসাঁ যুগ বলা হয়। এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্য সহ পৃথিবীর সর্বত্র শিল্প বিবর্তনের ফলে নতুন ধরনের গদ্যরীতি আরবী সাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণেই রচিত হতে থাকে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস ও ছোট গল্প, যা ইতিপূর্বে সনাতন ধর্মী আরবী-সাহিত্যে কখনো দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে 'কালীলা ওয়া দিমনা' 'এবং আল্‌ফ লায়লা ওয়া লায়লা' যে আধুনিক আরবী গল্পে প্রাধান্য বিস্তার করেনি এমন কথা

বলা যায় না। এসব ক্লাসিক-ধর্মী রচনার সঙ্গে আধুনিককালের উপন্যাস ও ছোটগল্পের তফাৎ শুধু আঙ্গিক গঠনে সীমাবদ্ধ নয়; টেকনিক, বিষয় বস্তু, বর্ণনাভঙ্গি, রচনা শৈলী এবং ভাষা ও শব্দ চয়নেও প্রচুর তফাৎ দেখা যায়। নতুন আঙ্গিকের গদ্য-শিল্পরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যেমন এগিয়ে এলেন শিল্পী-সাহিত্যিকরা তেমনি তাঁদের পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করলো কয়েকটি উন্নত মানের আরবী-সাহিত্য সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা। এ প্রসংগে বুতরুস আল-বুস্তানী (মৃ. ১৩০১ / ১৮৮৩) সম্পাদিত "আল-জানান" (অন্তর), আহ্‌মদ লুৎফী আল-সায়্যিদ (মৃ. ১৩৮৩ / ১৯৬৩) সম্পাদিত "আল জারীদা" (সংবাদপত্র), রাযযাক আল-গান্নাম সম্পাদিত "আল-ইরাক," জুরজী যায়দান সম্পাদিত ও প্রতিষ্ঠিত আল-হিলাল" (নবচন্দ্র) এবং ইয়াকূব সাররূফ সম্পাদিত ও বৈরুত থেকে প্রকাশিত "আল-মুক্‌তাতাফ" প্রভৃতি পত্র পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩] আধুনিক আরবী গদ্যরীতির শিল্প-বিন্যাসে এবং বিশেষ করে আরবী উপন্যাস ও ছোট গল্পের বিকাশ সাধনে এসব আরবী পত্র-পত্রিকার ভূমিকা নিঃসন্দেহে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক টেকনিকে আরবী ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় যাঁরা সর্ব-প্রথম আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে সিরিয়ার সালীম আল্-বুস্তানী (মৃ. ১৩০২ / ১৮৮৪), জুরজী যায়দান (মৃ. ১৩৪৩ / ১৯২৪) ও ফারাহ আনতূন (মৃ. ১৩৪১ / ১৯২২), মিসরের শেখ মুহম্মদ আবদুহ্ (মৃ. ১৩২৩/ ১৯০৫) ও মুস্তাফা লুৎফী আল মানফালূতী (মৃ. ১৩৪৩/১৯২৪), লেবাননের খ্রীস্টান দার্শনিক কবি জুবরান খলীল জুবরান (মৃ. ১৩৫০/১৯৩১), সাংবাদিকও সাহিত্যিক সায়্যিদ আল্-বুস্তানী (মৃ. ১৩৪৬/১৯২৭) ও ইয়াকূব সার্‌রূফ (মৃ. ১৩৪৬/১৯২৭) এবং ইরাকের ইব্রাহীম হিলমী আল-উমর (মৃ. ১৩৬০/১৯৪১) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব কথাশিল্পীকে রেনেসাঁ আন্দোলনের তথা আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যের অগ্রদূত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এঁরা সবাই প্রথমতঃ ছোটগল্প এবং পরে উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এঁদের রচনায় ফরাসী ও রুশীয় সাহিত্যের প্রভাব পড়লেও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এঁরা শেষ পর্যন্ত স্বকীয়তা অর্জন করেন। ফলে কিছু সংখ্যক মননশীল রচনা সার্বজনীনতার জন্য বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। আল্-মানফালূতীর ছোটগল্প সংকলন 'আল্-আবারাত' (অশ্রু) এবং

'আল-নাযিরাত' (দৃষ্টি) আধুনিক আরবী ছোটগল্পের উল্লেখযোগ্য একটি নিদর্শন। এর পর আধুনিক আরবী কথা-সাহিত্যের দ্বিতীয় দলের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে সাহিত্য কর্মে অধিক খ্যাতি অর্জন করেন কথা-শিল্পী ও ছোটগল্প-লেখক কায়রোর মুবাহ্ ইলাহী (মৃ. ১৩৪৯ / ১৯৩০), আয়েশা তাইমূর (মৃ. ১৩২০ / ১৯০২) ও মুহাম্মদ তাইমূর (মৃ. ১৩৪০/ ১৯২১)। মুবাহ্ ইলাহীর ছোটগল্প আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা হলেও গল্পের টেকনিক বা কলাকৌশল প্রাচীন-ধর্মী 'মাকা-মাত' কিংবা 'আলফ লায়লা ওয়া লায়লা' থেকে আয়ত্ত করা হয়েছে। অয়েশা তাইমূরও প্রাচীন ধারার 'মাকামাত' থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। তবে তাঁর গল্পে মুসলিম ঐতিহ্য ও সামাজিক চিত্র লক্ষ্য করবার মতো। তিনি গীত বালিরিক ধর্মী কবিতা ও শোক- গাঁথা (মসিয়া) লিখেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তবে মুহাম্মদ তাইমূর তাঁর সামাজিক সাহিত্যকর্ম একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি রুশ ছোটগল্পের রূপকার আনতন প্যাবলভিচ চেখব (১৮৬০-১৯০৪ খ্রী.) ও ফরাসী কথাশিল্পী গী দ্য মোপাসাঁ-এর অনুসারী ছিলেন। ফলে তাঁর রচনায় তাঁদের লেখার ছাপ সুস্পষ্ট।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন, মিসরের ত্বাহা হোসাইন (মৃ. ১৩৯৩/ ১৯৭৩), তাওফীক আল-হাকীম (মৃ. ১৪০৭ / ১৯৮৭), মাহমূদ তাইমূর (মৃ. ১৩৯৩/ ১৯৭৩), মাহমূদ তাহির লাশীন (মৃ. ১৩৭৪ / ১৯৫৪), নাজীব মাহফূয (জন্ম ১৩৩০/১৯১১), ডক্টর ইউসুফ আল-সিবায়ী (মৃ. ১৩৯৮/ ১৯৭৮), ইব্রাহীম আল্ মিসরী (মৃ. ১৪০০/১৯৭৯), আবদ আল মাসীহ হাদ্দাদ (মৃ. ১৩৮৩/ ১৯৬৩), ইব্রাহীম 'আবদ আল-কাদির আল-মাযিনী (মৃ. ১৩৬৯/ ১৯৪৯), এবং ইরাকের জা'ফর আল-খলীলী।

আধুনিক আরবী কথা-সাহিত্যিকদের তৃতীয় দলের আবির্ভাব ঘটে ১৩৭০/১৯৫০ সালের পর। এঁদের নানা-রূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা আধুনিক আরবী কথা-সাহিত্যকে গৌরবময় দিকে এখনো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই দলে যাঁরা আজ পর্যন্ত নিরলস সাহিত্য-কর্ম করছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মিসরের প্রখ্যাত ছোটগল্প লেখক ইউসুফ ইদ্রীস (জ. ১৩৪৬/১৯২৭), ইউসুফ শারোনী (জ. ১৩৪৩/১৯২৪), সারওয়াত আবাযা,

নাজীব মাহ্‌ফূয, ইয়াইয়া হাককী (জ. ১৩২৩ / ১৯০৫) হোসাইন ফাওযী, লেবাননের ইউসুফ আল-গোয়াব, ওলী তাবিয়ী, হোসাইন কাসিম, জাবরান ইব্রাহীম জাবরান আলেপ্পোর 'আবদ্‌ আল-রহমান বেগ, মাযাগানের ইদ্রীস শারাবী, দামেস্কের যাকারিয়্যাহ তামির এবং ইরাকের উসমান সাদী। এঁদের মধ্যে জাবরান প্রতিক্রিয়াশীল কথাশিল্পী।

মূলতঃ আধুনিক আরবী কথা-শিল্পে স্বাজাত্যবোধ, ঐতিহ্যচেতনা, দেশ-প্রেম ছাড়াও রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও যৌন-সম্পর্কিত জীবন-যন্ত্রণা। শুধু তাই নয় লেখকদের একাগ্রতা, ঐকান্তিকতা এবং আন্তরিকতা আধুনিক আরবী কথা-সাহিত্যকে এখন পর্যন্ত শিল্প-সমৃদ্ধ করে তুলছে।

মিসরের কথা-সাহিত্যিক তথা ঔপন্যাসিক ও ছোট-গল্প লেখক ৭৭ বছর বয়স্ক নাজীব মাহ্‌ফূযের সুইডিস একাডেমী কর্তৃক প্রদত্ত সাহিত্যে ১৯৮৮ সালের নোবেল প্রাইজ অর্জন শুধু আরবী ভাষা-ভাষী মধ্য-প্রাচ্যের জন্য নয়, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের গৌরব, আনন্দ ও সুনাম বহন করে এনেছে। তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে শুধু বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন নি, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের মুখও তিনি উজ্জ্বল করেছেন। আরবী ভাষার লেখকদের মধ্যে নোবেল পুরস্কার বিজয় এটাই প্রথম।

ভাষা হিসেবে আরবী বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষাগুলোর অন্যতম হলেও প্রাচীন গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত এবং চৈনিক সাহিত্যের যখন উৎকর্ষ ঘটে তখনো (৫০০ খ্রীস্টাব্দে) পর্যন্ত আরবী সাহিত্যের ততটা উন্মেষ ঘটেনি। ইসলামের আগমনের পর কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই ভাষার যে এক আশ্চর্য বিস্তার ও বিকাশ ঘটে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। মধ্যযুগে আরবী পৃথিবীর একটা বিস্তৃত এলাকার ব্যবহারিক ও রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে গণ্য হওয়ায় নানা ধরনের রচনা আরবীতে প্রকাশিত হয়। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমালোচনা, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, বিজ্ঞান, জীবনচরিত প্রভৃতি সকল বিষয়েই আরবীতে অসংখ্য গ্রন্থ লেখা হয়। এই প্রকাণ্ড জ্ঞানভাণ্ডার শুধু আরবী-ভাষী অথবা মুসলমান সমাজের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্যই এক অমূল্য সম্পদ। ৬৫৬/১২৫৮ সাল থেকে ১২১৩/১৭৯৭ সাল পর্যন্ত কিছুটা নির্জীব থাকার পর আরবী সাহিত্যের গতি আবার পূর্ণ ও নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে আরবী

সাহিত্যের প্রধান প্রাণ-কেন্দ্র মিসরের কায়রো মহানগরী। মিসরীয় পণ্ডিতগণ একাধারে ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সমালোচনা, ইতিহাস, জীবন-চরিতভিত্তিক নানা ধরনের বই পুস্তক লিখে আধুনিক আরবী সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন। মধ্যযুগে রচিত 'কালীলা ওয়া দিমনা', 'আলফ লায়লা ওয়া লায়লা', 'মাকামাত' ইত্যাদি বিস্ময়কর কাহিনী ও রম্যরচনা থেকে ইউরোপে মহৎ উপন্যাস সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হয়। বিভিন্ন ইউরোপীয় সাহিত্যিকের উপর আরবী উপন্যাসের প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে আরবী কবিতা আরবী গদ্যের চেয়ে অনেক বেশী সমৃদ্ধ। প্রাক্-ইসলামী যুগে কবিতা দিয়েই আরবী সাহিত্যের উৎপত্তি। তখন থেকে যুগে-যুগে শ্রেষ্ঠ কবিদেরকে পুরস্কৃত করার নিয়ম চালু ছিল। নাজীব মাহ্ফূয হলেন বিশ্বের প্রথম মুসলমান যিনি সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ লাভ করলেন। মূলতঃ সুইডেনের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও ডিনামাইট আবিষ্কারক ডক্টর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুর পর ১৯০১ সাল থেকে নোবেল প্রাইজ প্রবর্তিত হওয়ায় প্রায় ৮৮ বছর পর বিশ্বের এক চতুর্থাংশ মুসলমান-নাগরিকের প্রতিনিধির ভাগ্যে প্রথম এই পুরস্কার জুটলো। আধুনিকযুগের আরবী উপন্যাস ও ছোটগল্প সত্যিকার অর্থে ক্লাসিক ধর্মী আরবী সাহিত্যের রূপ ও রীতি অনুসারী নয়। বিগত শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে আরবী উপন্যাস ও ছোট-গল্প বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই সময় মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সবচেয়ে ঘন-বসতিপূর্ণ রাজধানী শহর কায়রো সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৪]

নাজীব মাহ্ফূযের ব্যক্তিগত জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে বেশী কিছু জানা যায় না। তাঁর সাহিত্যকর্মের উপর তিনি ঘন ঘন সাংবাদিক সাক্ষাৎ-কার দিলেও নিজের ব্যক্তিগত জীবনের উপর খুব কম কথা বলতেন। এ ব্যাপারে তিনি কদাচিৎ সাক্ষাৎকার দেন। মূলতঃ তিনি জীবন কাটিয়েছেন প্রায় নির্জনে ও অগোচরে। তিনি সর্বদাই প্রচার বিমুখ ছিলেন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর এবং মতান্তরে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে মিসরের রাজধানী কায়রোর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ পুরাতন মুয়িয্যীয় এলাকা আল-জামালিয়্যাতে এক নিম্ন মধ্য-বিত্ত মুসলিম পরিবারে নাজীব মাহ্ফূয জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম

ছিল নাজীব মাহ্‌ফূয 'আবদ আল-'আযীয। তাঁর বাবা মাহ্‌ফূয একজন নিম্ন-পদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন। পরে তিনি চাকুরী ছেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং পরিবারের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনেন। পিতা-মাতা, চার বোন ও তিন ভাইসহ নাজীবের পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল নয়। ভাই ও বোনদের মধ্যে তিনি সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন এবং অব্যবহিত জ্যেষ্ঠ সদস্য তাঁর চেয়ে ৯ বছরের বড় ছিলেন। নাজীবের মাতা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম মহিলা ছিলেন। নাজীবের বয়স যখন ৬ বছর তখন তাঁর বাবা জামালিয়্যাহ ত্যাগ করে কায়রোর দক্ষিণ-পূর্ব শহরতলীর আব্বাসিয়্যাহ্‌ নামক আধুনিক ইউরোপীয় স্টাইলে তৈরী এলাকার একটি নতুন বাড়ীতে বসবাস শুরু করেন। উল্লেখ্য যে, চার বছর বয়সে নাজীব জামালিয়্যাহ্‌ এলাকার আল শায়খ-বুহায়রা নামক প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু ভর্তি হওয়ার দুই বছর পর তিনিও পরিবারের সকল লোকজনসহ আব্বাসিয়্যাহ্‌ চলে আসেন। এখানেই নাজীব বরাবর বড় হন, মানুষ হন এবং পরিবারের লোকজনের সাথে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। শৈশবে নাজীব একপ্রকার মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে কিছু সময় ঘরে বসেছিলেন। ফলে ১৯২৫ সালে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। নাজীবের অন্যান্য ভাইবোন মিসরীয় রীতি অনুসারে পরিণত বয়সেই বিবাহ ক'রে ভিন্ন ভাবে বসবাস করতে থাকলে নাজীব একাকী তাঁর বাবা-মার সাথে থাকলেন। নাজীব ১৯৫৪ সালে ৪২ বছর বয়সে 'আতিয়্যাহ আল্লাহ্‌ নামে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কায়রোর আল 'আজুযা এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য স্থানান্তরিত হন। তিনি ফাতিমা ও উম্মে-কুলসূম নামক দুই কন্যার জনক। ফাতিমা হলেন বড় মেয়ে এবং তাঁর ডাক নাম ফাতিন। উম্মে কুলসুম হলেন ছোট মেয়ে এবং তাঁর ডাক নাম হলো হাদী। মিসরীয় রীতির তুলনায় নাজীবের দেরীতে বিবাহ করার কারণ হিসেবে বলা যায় যে, আব্বাসিয়্যাহ্‌ এলাকায় বসবাস করার সময় এবং মাধ্যমিক স্কুলে পড়া-লেখার শেষ দিনগুলোতে তিনি একই এলাকার 'আয়িদা শাদ্দাদ নামক সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক মেয়ের প্রেমে পড়েন। নাজীব তাকে বিবাহ করতে পারেন নি বলে ব্যর্থ প্রেমের কারণে অনেক বছর যাবৎ অবিবাহিত অবস্থায় জীবন যাপন করেন।

উল্লেখ্য যে, নাজীব ১৯২৫ সালে ১৫ বছর বয়সে প্রাইমারী শিক্ষা শেষ করে মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় তিনি ইতিহাস, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে অধিক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তবে তিনি বিদেশী ভাষায় খুব দুর্বল ছিলেন। মাধ্যমিক স্কুলের পড়ালেখা শেষে তিনি পার্শ্ববর্তী "কাসর আল-শাওক" এলাকার সহপাঠী কামালের সাথে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ ছাড়াই ১৯৩০ সালে ১৯ বছর বয়সে দর্শন শাস্ত্রে অধ্যয়ন করার সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর তিনি ফুয়াদ আল-আওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বর্তমানে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়) কলা অনুষদের দর্শন বিভাগে ভর্তি হন। এ সময় কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি অতিব্যস্ত কেন্দ্রে পরিণত হয়। ছাত্রদের মধ্যে বড় ধরনের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের অনুসারী পাওয়া যেতো। নাজীবের 'আল-কাহিরা আল্-জাদীদা' (আধুনিক কায়রো)-এর প্রথম অধ্যায়ে এইসব ছাত্রদের জীবন ও অভিলাষের একটি প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই সময় ডারউইনের বিবর্তনবাদ অধ্যয়নের ফলে নাজীব কঠিন ধর্মীয় সংকটের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে থাকেন। যদিও তিনি কোন এক সময় ধর্মীয় বিষয়ে অবিশ্বাসী হয়ছেন, তবে তিনি কখনো একেবারে নাস্তিক হন নি। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপকগণ ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় ক্লাসে লেকচার দিতেন, যা অনুকরণ করতে নাজীবের খুবই কষ্ট হতো। নাজীবের এক ভাই তাঁকে ইংরেজী থেকে আরবীতে একটি বই অনুবাদ করে ইংরেজীর উপর দক্ষতা অর্জনের পরামর্শ দেন। অতঃপর নাজীব জেমস বেইকী (James Baikie)কর্তৃক ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে লিখিত ও প্রকাশিত *Ancient Egypt*[৫] গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন এবং এর নামকরণ করেন 'মিসর আল্-কাদীমা' (প্রাচীন মিসর)। এই সময় নাজীব স্নাতক কলার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।[৬]

১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ থেকে দর্শন শাস্ত্রে কৃতিত্বের সাথে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার পর স্নাতকোত্তর ক্লাসে ভর্তি হন এবং এক বছর যাবৎ শেখ মুস্তফা আবদ আল-রাযিকের তত্ত্বাবধানে মুসলিম দর্শনের "নন্দনতত্ত্ব" (Aesthetics) বিষয়ে এম. এ.

থিসিস করতে থাকেন। এই সময় নাজীব সাহিত্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করবেন, না কি দর্শন শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা তথা ডক্‌টরেট ডিগ্রী নেবেন এই অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি উচ্চ শিক্ষা ত্যাগ করে সাহিত্য চর্চার কাজ বেছে নেন। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রশাসনে ইতিমধ্যে সেক্রেটারী পদের একটি চাকরীতেও যোগদান করেন এবং ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। তাঁর পরিকল্পিত থিসিসের বিষয়-মনোনয়ন প্রতিটি শিল্পিজনোচিত বস্তুর প্রতি তাঁর যে স্বরভাবিক প্রবণতা রয়েছে তার ইঙ্গিত বহন করছে। তিনি নিজে ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষে কানূন (*Quanun*) নামক প্রাচ্য বাদ্য যন্ত্রের তার বাজানোর প্রশিক্ষণ পেতে চেষ্টা করেন। তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল সঙ্গীতের ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের মাধ্যমে নন্দনতত্ত্বের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। পূর্ণ একটি বছর প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর তিনি নিজেই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, কানূন বাদ্যযন্ত্র বাজানোর প্রশিক্ষণ ও নন্দনতত্ত্বের মধ্যে আদৌ সম্পর্ক নেই। তবে তাঁর সাহিত্য অভি-লাষ তাঁকে পরিত্যাগ করে নি। তিনি নন্দনতত্ত্বকে দর্শন ও সাহিত্য উভয়ের সমন্বয়কারী একটি ক্ষেত্র হিসাবে ধারণা করেন। এক সময় তিনি সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যকার একটি ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বিতারও শিকার হন।[৭]

নাজীব তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে (আল্‌-সুলাসিয়্যাত) তাঁর শৈশবের একটি চিত্ররূপময় প্রতিবেদন তুলে ধরেন। তিনি শৈশবে খুব আনন্দমুখর দিন কাটান। তাঁর পিতা মাহ্‌ফূয ত্রয়ী উপন্যাসের নায়ক কামালের পিতার ন্যায় কঠোর ছিলেন না। তিনি বালক নাজীবকে সম্ভাব্য সব প্রকার স্বাধীনতা দেন। নাজীব রাস্তায় বল খেলতেন এবং পুরাতন মডেলের গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাতেন। তিনি শুক্রবার-সহ ছুটির দিনগুলোতে বন্ধু-বান্ধবদেরকে নিয়ে শহরের পুরাতন অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন। সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হিসাবে তিনি যৌবন ও বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত তাঁর মায়ের সাথে সাথে ছিলেন। তাঁর অন্যান্য ভাই-বোন বিবাহ করে ঘর ত্যাগ করেন। সুতরাং তাঁর শৈশব ও বাল্য জীবনের উপর তাঁর মায়ের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। নাজীবের বয়স যখন পনর বছরেরও কম তখন তাঁর এক স্কুল সহপাঠী স্কুল ত্যাগ ক'রে পরিশেষে পুরাতন মিসরে একটি দোকানের মালিক হন। নাজীব তাঁর বন্ধুদের একটি দল নিয়ে নিয়মিত সেই

দোকানে যেতেন এবং পুরাতন মডেলের একটি কফি হাউজে বসে অবসর সময় কাটাবার শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বন্ধুদের সাথে কালো চা অথবা নারজিলীর (*Narjiliah/Narghile* পারস্যের পানির পাইপ বা হুককা) ধূমপান করে সময় কাটাতেন। জীবনের এই পর্যায়ে নাজীব কায়রোর চিত্রবৎ এলাকার পুরাতন অধিবাসীদের জীবনযাপন প্রণালী পছন্দ করতে থাকেন। এর ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি তাঁর 'যুকাক আল্-মিদাক্ক' (মিদাকের গলি) ও 'খান আল্-খলীলী' (খান আল্-খলীলী গলির আবাসিক এলাকা)-এর ন্যায় উপন্যাসগুলোর প্লট বা ক্ষেত্র তৈরী করেন। তরুণ বয়সের শুরুতেই তিনি ডিটেক্টিভ উপন্যাসের একজন উৎসাহী পাঠক ও বাধ্যতামূলক সিনেমা দর্শক ছিলেন। নাজীবের সর্বপ্রথম লেখা তদানীন্তন জনপ্রিয় ডিটেকটিভ গল্প লেখক হাফিয নাজীবের অনুকরণে রচিত তাঁর অনুকরণের আর একটি লক্ষ্যবস্তু ছিল মুস্তফা লুৎফী আল-মানফালূতীর (মৃ. ১৩৪৩/১৯২৪) ছোটগল্প। মূলতঃ আল-মানফালূতীর রোমান্টিক ধরনের গল্প ও মনোরম কাহিনীগুলো বয়ঃসন্ধিকালের (teenage) শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকারা পাঠ করতো। তাঁর আবেগময় এবং কখনো বিরক্তিকর স্টাইল ছাত্ররা ক্লাশের রচনায় প্রায়ই ধার নিতো। একইভাবে নাজীব সনাতন রীতির আরবী কবিতা লেখার কিছুটা উদ্যোগও নেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে তিনি ছন্দ ও মাত্রা ত্যাগ করে বাহ্যতঃ প্রবাসী কবিদের মডেলে গদ্য কবিতা (Free verse) রচনায় পারদর্শী হওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি ত্বাহা হোসাইনের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'আল-আইয়্যাম' (কালের প্রবাহ) পাঠ করেন এবং খুব তাড়াতাড়ী এর অনুকরণে তাঁর নিজস্ব গল্প রচনা করেন। তাঁর লিখিত গল্পের নাম ছিল 'আল-আওয়াম' (প্রবহমাণ বছরগুলো)। তবে নাজীবের তরুণ বয়সের এই সব শিল্পকর্ম বা রচনার কোন একটি আজ পর্যন্তও প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মাধ্যমিক স্কুল জীবন প্রকৃত অর্থে তাঁর সাহিত্য শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে পারে নি বলে মনে হয়। তিনি কোন প্রেরণা-দায়ক শিক্ষকের নাম উল্লেখ করেন নি। যদিও মাধ্যমিক স্কুলে ক্লাসিক্যাল আরবী-সাহিত্য শিক্ষা দেয়া হতো, কিন্তু অধিকাংশ আরবী স্কুলে এর উপস্থাপনের রীতিনীতি কল্পনা মুক্ত ও সনাতনধর্মী। পুরাতন কবিতাগুলো মুখস্থ করানো হতো এবং গদ্য সনাতন রীতিতে

সমালোচনা ব্যতিরেকেই পড়ানো হতো। ফরাসী ও ইংরেজী সহ বিদেশী ভাষায় তিনি তেমন দক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি। অতএব এই স্তরে তাঁর পাঠক্রম মূল আরবী গ্রন্থে অথবা আরবীতে অনূদিত সাহিত্য-কর্মে সীমাবদ্ধ ছিলো। মাধ্যমিক স্কুলের পড়ালেখা শেষ করার পূর্বেই নাজীব মিসরের বেশ কয়েকজন আধুনিক লেখকের সাহিত্য-কর্মের সাথে পরিচিত হন। তাঁরা আরবী সাহিত্যে নতুন নতুন চিন্তাধারা, ভাব ও প্রণালী প্রবর্তনের জন্য সংগ্রাম করছিলেন। তাঁদের মধ্যে আল-মানফালূতী, ত্বাহা হোসাইন, সালামা মূসা, আল-আক্কাদ, আল-মাযিনী, ইয়াহিয়া হাক্কী, মাহমূদ তাইমূর ও তাওফীক আল হাকীমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাজীব মাহ্‌ফূয এঁদের লেখা দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

ত্বাহা হোসাইন ১৯২০ এর শেষ দিকে আরবী-শিক্ষায় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক ছিলেন। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রকাশিত 'ফী আল-শির আল-জাহিলী' (জাহিলী কবিতার ক্ষেত্রে) গ্রন্থটি গ্রহণীয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ছিলো। ফলে তিনি আল-আযহার সাহিত্যগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। অপরদিকে গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় সাহিত্যরীতি থেকে মুক্তির পথ নির্দেশনা দিয়ে মিসরীয় যুবক সম্প্রদায়কে নতুন ভাবে চিন্তায় উদ্দীপ্ত করে। গ্রন্থটি নাজীবের বুদ্ধির বিকাশে সর্বোচ্চ প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া ত্বাহা হোসাইনের ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থটিও নাজীব মাহ্‌ফূযকে আরবী সাহিত্য মূল্যায়নের প্রতি গভীর ভাবে মনোযোগী করে এবং আবুল আলা আল্-মা'আররী (মৃ. ৪৪৯/১০৫৭), আল-মুতানাব্বী (মৃ. ৩৫৮/৯৬৭) ও ইব্‌ন আল-রুমী (মৃ. ২৮৪/৮৯৬)-এর ন্যায় সনাতনধর্মী প্রখ্যাত কবিদের কবিতা তাঁকে নতুন আলোকে পাঠ করতে সহায়তা করে। আবুল আলার দার্শনিক কবিতা এবং জীবন, সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে তাঁর দর্শনের ভিত্তি নাজীবকে একটি দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করতে অনুপ্রাণিত করে। এই সময় প্রখ্যাত মিসরীয় সাহিত্যিক ও সমালোচক সালামা মূসা (মৃ. ১৩৭৮/১৯৫৮)-এর লেখা নাজীবকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তিনি সালামা মূসার নিকট বিজ্ঞান, সমাজবাদ ও সহিষ্ণুতার প্রশিক্ষণ নেন। নাজীব ইংরেজ প্রাকৃতিবাদী চার্লস রবার্ট ডারউইন (মৃ. ১৩০০/১৮৮২), অস্ট্রিয়ার

মনোসমীক্ষণবাদের প্রতিষ্ঠাতা সিগমন্ড ফ্রয়েড (মৃ. ১৩৫৮/১৯৩৯), জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস (মৃ. ১৩০১/১৮৮৩) ও সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (মৃ. ১২১৯/১৮০৪)-এর মতবাদ ও লেখা পড়তে খুব আনন্দ পেতেন। তিনি সালামা মূসার অনুকরণে প্রখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক কাউন্ট লিও টলস্টয়ের (মৃ. ১৩২৮/১৯১০) লেখা *War and Peace*, নরওয়ের কবি ও প্রখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইব্‌সেন (মৃ. ১৩২৪/১৯০৬), ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ও ঔপন্যাসিক হারবার্ট জর্জ ওয়েল্‌স্ (মৃ. ১৩৬৬/১৯৪৬), আয়ারল্যান্ডবাসী প্রখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শো (মৃ. ১৩৭০/১৯৫০) প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখা পড়তে এবং মিসরের ফিরাউনী ঐতিহ্য পাঠে ব্যস্ত থাকতে আনন্দ পেতেন। তিনি পরে সালামা মূসা কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাগাজিন "আল-মাজাল্লা আল-জাদীদা" তে লিখতে থাকেন। তিনি আল-'আক্কাদকে প্রেরণার একটি উৎস হিসাবে মনে করতেন। তাঁর মাধ্যমে সাহিত্যকলা ও ভাবের স্বাধীনতা ও সৌন্দর্যের ন্যায় বিভিন্ন মূল্যবোধ তিনি অর্জন করেছেন বলে স্বীকার করেন। আধুনিক আরবী সাহিত্যিকদের সনাতন সাহিত্য-রুচি ও ভাবরীতি থেকে মুক্তির যে প্রভাব তাঁর উপর পড়েছে তিনি তার পর্যালোচনা করেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তথা জীব-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে লেখা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই অধ্যয়ন করতে নাজীব প্রয়াস পান। এই বইগুলোর অধিকাংশই হলো সারূফ, মাযহার এবং মূসার ন্যায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীপূর্ণ লেখকদের অনুবাদ বা রচনা। আঠার বছর বয়সে নাজীব একটি কঠিন ধর্মীয় সংকটের দ্বারা পরাভূত হন। মহান আল্লাহ্ ও ইসলামের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস থাকায় তিনি পরবর্তী পর্যায়ে এই সংকট কাটিয়ে উঠেন। এই সময় তিনি বিবর্তনবাদের উপর ডারউইনের বই *The Origin of Species* পাঠ করেন এবং এটাকে পবিত্র কোরআনের বর্ণনাকৃত সৃষ্টির ঘটনার সাথে তুলনা করেন। ফলে কিছু সময়ের জন্য একজন অবিশ্বাসী মুসলিম হলেও তিনি কখনো একজন সক্রিয় নাস্তিক ছিলেন না।[৮]

অল্পবয়সেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করতে নাজীব খুব আনন্দ পেতেন। মূলতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে এবং সাদ যগলুল পাশার (১৮৫৭-১৯২৭) ওয়াফ্‌দ পার্টির নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে সংঘটিত

বিপ্লবের আট বছর পূর্বে নাজীব মাহ্‌ফুয জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল সহ তাঁর প্রথম জীবনে মিসরে রাজনৈতিক অশান্তি বিরাজ করছিলো। তাঁর মত একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত মিসরীয় বালকের পক্ষে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণের কল্পনা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই তিনি ওয়াফ্‌দ পার্টিকে সমর্থন দেন এবং যগলূলের আদর্শে তিনি বিশ্বাস করেন। সুতরাং সরাসরি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে বিরত থেকে ১৯৩০ সালে নাজীব মাধ্যমিক স্কুলের লেখা পড়া শেষ করেন এবং কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হন। এই সময় কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি ব্যস্ত কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ছাত্রদের মধ্যেও বড় বড় রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক ধারার অনুসারীদের অস্তিত্ব ছিল। নাজীবের উপন্যাস 'আল-কাহিরা আল-জাদীদা' (আধুনিক কায়রো) এই সব ছাত্রদের জীবন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটি পরিমিত ও প্রাণবন্ত প্রতিবেদন পাঠকদের সামনে তুলে ধরে। এই উপন্যাসের নায়ক চরিত্রে নাজীবের আত্ম-প্রতিকৃতি লক্ষণীয়। তবে গ্রন্থটিতে নাজীবের দর্শন ক্লাসের সহপাঠী আলী ত্বাহার বুদ্ধিমত্তার বিকাশের বর্ণনা সম্ভবতঃ দর্শনের রাজ্যে নাজীবের কিছু দুঃসাহসিক পদচারণার পরিচয়—যা পাঠকের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রারম্ভে আলী ত্বাহার ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে জার্মান দার্শনিক জর্জ উইলহেলম ফ্রেডারিক হেগেল (মৃ. ১২৪৭/১৮৩১), জার্মান রসায়নবিদ উইলহেলম উসতওয়াল্‌ড (মৃ. ১৩৫১/১৯৩২) এবং অস্ট্রিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী ও দার্শনিক আর্নেস্ট মাখের (মৃ. ১৩৩৫/১৯১৬) লেখা পড়ে এবং জীবন ও প্রকৃতির জড়বাদী ব্যাখ্যা গ্রহণের মাধ্যমে সান্ত্বনা পান। অতএব আলী ত্বাহার আধ্যাত্মিক ভ্রমণ যা মক্কা থেকে শুরু হয়, তা মস্কোতে শেষ হয়। তবে নাজীব মাহ্‌ফুয নিজে কখনো একজন সংগ্রামী মার্কসবাদী ছিলেন না। আলী ত্বাহার সমাজতন্ত্রের তুলনায় তাঁর সমাজতন্ত্র অনেক বেশী সরল ছিলো। পরে তিনি একটি ব্যক্তিগত ও উচ্চমানের আধ্যাত্মিক ধরনের সমাজতন্ত্রের ফরমূলা দিতে চেষ্টা করেন। স্নাতক পূর্বের ছাত্র থাকা কালীন নাজীব দর্শন বিষয়ে "মাজাল্লা আল-জদীদা" ও "আল-মাআরিফ" সাময়িকীদ্বয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলো ছাপতে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-সূচীর যে-সব পুস্তক তিনি পাঠ করেন, তা থেকে তিনি এইসব প্রবন্ধের

উপাদান সংগ্রহ করেছেন বলে ধারণা করা হয়। এইসব প্রবন্ধ তেমন দায়িত্ব ছাড়াই দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বড় বড় ধারাকে (অর্থাৎ বাস্তব ধর্মিতার উপর; আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণার উপর; প্রাচীন ও আধুনিককালের মনোবিজ্ঞানের উপর) জনপ্রিয় করার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলো। তিনি প্রাচীন মিসরের উপর ভিত্তি করে লিখিত একটি ইংরেজী বই আরবীতে অনুবাদ করেন যা 'আল কাহিরা আল-কাদীমা' নামে ১৯৩২ সালে ছাপানো হয়।[৯]

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্য থেকে নাজীব শুধু কথাসাহিত্য বা উকসুসা (Fiction)-কেই বেছে নেন। প্রথম জীবনেই তিনি ছোট গল্প লেখায় পারদর্শী হতে চেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে তিনি গল্প লেখার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য প্রেরণার নকশা-চিত্র অংকন অব্যাহত রাখেন। কিন্তু তিনি জার্নাল ও সাময়িক পত্রগুলোকে তাঁর প্রবন্ধের তুলনায় গল্পে কম আগ্রহী দেখেত পান। তখন তিনি একজন গল্পকার হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

উল্লেখ্য যে, দর্শনের উপর তাঁর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ লাভের কারণে তিনি সাহিত্য সমালোচনার চেষ্টা করেন নি। তিনি কবিতা রচনায়ও আর চেষ্টা করেন নি, অথচ কবিতা রচনার মাধ্যমেই অনেক আরব পণ্ডিতের সাহিত্য সাধনার শুরু। যদিও সমাজের কিছু লোকের দৃষ্টিতে কথা-সাহিত্য নিম্ন-মানের একটি সাহিত্যকর্ম ছিল, কিন্তু তাঁর অকপটচিত্ত ও অনমনীয়তা সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছিলো। আহ্মদ তাইমূর ব্যতীত ত্রিশের দশকের কয়েকজন প্রভাবশালী লেখকদেরকে আমরা সাময়িক বিরতিতে উপন্যাস লিখতে দেখতে পাই। গল্প-রচনার অসাধারণ ক্ষমতা নাজীব জন্মগতভাবেই অর্জন করেছিলেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি কথা-সাহিত্যের মোহে আচ্ছাদিত হন। দর্শন, মনোবিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের সাথে তাঁর পরি-চিতি যা কাল্পনিক সাহিত্যের জন্য তাঁর প্রচণ্ড আবেগ দমন করতে পারেনি তা সম্ভবতঃ তাঁকে কথা-সাহিত্যের কলা কৌশলে বহুমুখী হওয়ার জন্য সচেতন করে। তাঁর মতে শিল্পীজনোচিত কথা-সাহিত্য (আল-কিস্যা আল-কান্যিয়্যাহ্) একটি সাধারণ গল্পের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। শিল্প-সম্মত কথা-সাহিত্য অবশ্যই চরিত্র বর্ণনা এবং মনোবিজ্ঞান,

গীতধর্মিতা এবং ব্যঙ্গকৌতুক, দার্শনিক বিষয়বস্তু এবং সামাজিক কল্পনার মত অনেক মানবীয় মূল্যবোধকে বাস্তবরূপ দিয়ে থাকে। ১৯৪৫ সালে তিনি "আল-কিস্যা ইনদাল আক্কাদ" নামক একটি মূল্যবান প্রবন্ধে উক্ত মতামত উপস্থাপন করেন। একই প্রবন্ধে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, কথা-সাহিত্য (আল-উকসূাবা, কিস্যা) হলো আধুনিক যুগের কবিতা। এটা বিজ্ঞান, শিল্প ও বাস্তবের এমন একটি নতুন শিল্পকে অবশ্যম্ভাবী করে যা বাস্তবের প্রতি এবং আধুনিক মানুষের আবেগ ও কল্পনার প্রতি তার বহু পুরাতন আকর্ষণের মধ্যে একটি সম্ভাব্য সমন্বয় সাধন করে থাকে। এই সময় নাজীব বৈজ্ঞানিক না-হয়ে একজন শিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি দর্শন ত্যাগ করেন এবং বিস্তারিত স্টাইল ও আধুনিক সাহিত্য-কৌশলকে গ্রহণ করেন। এই পর্যায়ে এসে তিনি একজন সত্যিকার ও পরিপূর্ণ লেখক হওয়ার জন্য সাহিত্য সম্পর্কে আরো কিছু জানার জন্য আগ্রহী হন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর কথা-সাহিত্যের জ্ঞান খুব সীমিত এবং এলোমেলো। একজন প্রত্যাশিত ঔপন্যাসিক হওয়ার জন্য তাঁকে সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে ব্যাপক পরিচয় লাভ করতে হবে। ইংরেজী ভাষায় কিছুটা দক্ষতা অর্জনের ফলে অধিক জটিল বিদেশী উপন্যাসগুলো তখন তিনি পড়তে বেশ আনন্দ পান। তিনি একটি নিয়মানুগ পথনির্দেশনা এই সময় খোঁজে বেড়ান এবং ইংরেজ কবি ও নাট্যকার জন ড্রিংকওয়াটার (মৃ. ১৩৫৬/১৯৩৭) লিখিত *The Outline of Literature*-এর মধ্যে তা দেখতে পান। নাজীবের মতে, গ্রন্থটি তাঁকে বিশ্ব-সাহিত্য সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করে। ড্রিংকওয়াটার কালানুক্রমিক হিসাবে সাহিত্যধারা পর্যালোচনা করলেও বিভিন্ন জাতির সাহিত্য হিসাবে তা আলোচনা করেন নি। নাজীব সাহিত্যের সেরা গ্রন্থগুলোর পাঠ উনিশ শতকের শেষের দিকের ও বিশ শতকের গোড়ার দিকের (আধুনিক যুগের) লেখা গ্রন্থগুলো দিয়ে আরম্ভ করেন। তিনি কখনো একজন লেখক বা একটি সাহিত্যগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর পাঠ সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি বিশেষ করে প্রতিনিধিত্বশীল লেখকদের একটি অথবা দুইটি করে গ্রন্থ মনোনয়ন করতেন এবং পড়তেন।[১০]

উল্লেখ্য যে, নাজীব মাহ্‌ফূয দর্শন শাস্ত্রে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৪ সালে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার পর এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে

এক বছর অধ্যয়ন করার পর ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পদস্থ সেক্রেটারী হিসাবে চাকুরিতে নিয়োজিত থাকেন। এই সময় প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়ন ছেড়ে তিনি লেখাকে প্রাধান্য দেন। ১৯৩৯ সালে তিনি ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হন এবং ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত একই পদে নিয়োজিত থাকেন। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি চলচ্চিত্র ইনিস্টিটিউটের পরিচালক-মণ্ডলীর একজন পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৬২ সালে তিনি চলচ্চিত্র বোর্ডের একজন বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ সালে তিনি সিনেমা, রেডিও ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের একাডেমিক পরিষদের প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত নাজীব এই পদে বহাল থাকেন। ১৯৬৫ সালে একটি গণতান্ত্রিক ও সরকারী সিদ্ধান্ত জারীর মাধ্যমে শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য মিসরীয় উচ্চ পরিষদ তাঁকে একজন সদস্য মনোনীত করে। ১৯৬৬ সালে তিনি মিসরীয় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের একজন সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৬৭ সালে তাঁকে মিসরীয় চলচ্চিত্রের পরিচালনা বোর্ডের মহাপরিচালক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৬৮ সালে তিনি মিসরের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী ডক্টর সারওয়াত উকাশার মন্ত্রণালয়ের একজন সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হন এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত একই পদে বহাল থাকেন। ১৯৭১ সালের শেষ দিকে অথবা ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে তিনি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁর পেনশন বা অবসর ভাতা ছিল মাসে ১১০ মিসরীয় জনী। অবসর গ্রহণের পর পরই তিনি মিসরের বহুল প্রচারিত দৈনিক "আল-আহরাম" (পিরামিড) নামক আরবী পত্রিকার সম্পাদনা বোর্ডের সাথে সরাসরি জড়িত হন। এই পত্রিকায় তিনি তাঁর অনেকগুলি ছোটগল্প এবং বেশ কয়েকটি উপন্যাসের অংশ ধারা-বাহিক ভাবে প্রকাশ করেন। সরকারী উচ্চপদে বহাল থাকলেও সাহিত্যের নেশা তাঁর আজন্মের ছিলো। ১৯৮৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি এই প্রথম হলেও তিনি বহুবার সাহিত্যে অন্যান্য পুরস্কা-রের সম্মানে ভূষিত হন। সাহিত্য কীর্তির জন্য ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউ-নিয়ন এবং ডেনমার্ক সরকার তাঁকে অনারারী ডিগ্রী প্রদান করেন। ১৯৭০ সালে তিনি মিসরের জাতীয় সাহিত্য পুরস্কারের গৌরব অর্জন করেন। ১৯৭২ সালে তিনি মিসর সরকারের সর্বোচ্চ সম্মান রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

'দি কলার অব দি রিপাবলিক' লাভ করেন। তিনি লোটাস পুরস্কারও অর্জন করেন। নাজীব ১৯৪১ সালে তাঁর 'কিফাহ্ তীবাহ' (থিবেস-বাসীদের সংগ্রাম) নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি বাদশাহ্ ফুয়াদ ১ম-এর আরবী ভাষা একাডেমিতে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের প্রতিযোগিতার জন্য উপস্থাপন করেন। এই প্রতিযোগিতায় তাঁর উপন্যাসটি ৩য় স্থান অধিকার করে এবং তিনি ১৯৪২ সালে এর জন্য চল্লিশ পাউন্ডের প্রাইজ লাভ করেন। তখন একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী চাকুরের মাসিক বেতন ছিল মাত্র ১০ থেকে ১৫ মিসরীয় পাউন্ড। পরে উপন্যাসটি ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়।[১১]

নাজীব মাহ্‌ফূয নিঃসন্দেহে উপন্যাস বিবর্তনের ধারায় আরবী উপন্যাসের মধ্যে পাশ্চাত্য উপন্যাসের কলা-কৌশল ও ঐতিহ্যের অনু-প্রবেশ ঘটিয়েছেন। তবে আরবী জাতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য ও অনুপ্রেরণা তাঁর সাহিত্য কর্মে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তিনি একহাজার এক রজনী বা আরব্য উপন্যাস দ্বারা প্রভাবিত হন এবং মিসরীয় জাতীয়তাবাদের নবজাগরণে জাতীয় পরিবেশের সাথেও সম্পর্ক-যুক্ত হন। উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদী আন্দোলনের যুগ সম্পর্কে—তিনি উল্লেখ করে বলেন যে, যে কয়জন পাশ্চাত্য লেখকের লেখায় বাস্তবতার উদ্দেশ্য ও নীতি ফুটে উঠে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইংরেজ জীব-বিজ্ঞানী ও লেখক জুলিয়ান হ্যাক্সলী (জ. ১৩০৫/১৮৮৭), ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স (মৃ. ১৩৪৯/১৯৩০), ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যাকার জন গোল্‌সওয়ার্দী (মৃ. ১৩৫২/১৯৩৩) ও ফরাসী ঔপন্যাসিক গুস্তাফ ফ্লবেয়র (মৃ. ১২৯৮/১৮৮০)। এই সময় তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস জন ড্রিংকের *The Outline of Literature* গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদে তিনি ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যাকার গোল্‌স-ওয়ার্দি, হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস (মৃ. ১৩৬৬/১৯৪৬) এবং আরনল্ড বিনেতের (মৃ. ১৩৫০/১৯৩১) সাহিত্যকর্মের উপর একটি পর্যালোচনা দেখতে পান। গোল্‌সওয়ার্দী তাঁর *The Forsyte Saga* উপন্যাসে "ফর সাইট" পরিবারের ছোট একটি পৃথিবীর মধ্য থেকে আশে-পাশের বড় পৃথিবীকে কল্পনা করেন। এটা তখনই সংঘটিত হয় যখন ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক অবক্ষয় ঘটে। সুতরাং নাজীব

মাহ্‌ফূযের ত্রয়ী উপন্যাস (*The Trilogy*) ও গোলসওয়ার্দীর উপন্যাসের মধ্যে কাঠামোগত পরিকল্পনার যথাযথ মিল রয়েছে। ওয়েলসের *The Outline of History* গ্রন্থে জ্ঞান, বিজ্ঞান, অগ্রগতি ও ভ্রাতৃত্ব-বোধের প্রতি আস্থার যে চিন্তাধারার অবতারণা করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে নাজীব ও তাঁর সমসাময়িক লেখকদের মানসপটে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। এই সময় অন্যান্য যে-সব ইংরেজ লেখক ও সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের সাথে নাজীবের পরিচয় ঘটে, তাঁরা হলেন ঔপন্যাসিক ও ব্যঙ্গ লেখক চার্লস ডিকেন্স (মৃ. ১২৮৭/১৮৭০), আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শো (মৃ. ১৩৭০/১৯৫০) এবং ঔপন্যাসিক স্যার ওয়ালটার স্কট (মৃ. ১২৪৮/১৮৩২)। তবে এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, চার্লস ডিকেন্স বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গীতে ইংল্যান্ডের ভিক্টোরিয়ান যুগের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উত্তপ্ত জীবনের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার সাথে নাজীবের কায়রোর নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বর্ণনার ও স্টাইলের সাথে সম্পূর্ণ মিল থাকা সত্ত্বেও তা তাঁর মধ্যে একটি বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। নাজীব মাহ্‌ফূয রুশ শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কাউন্ট লিও টলস্টয় (মৃ. ১৩২৮/১৯১০)-এর *War and Peaec*-এর আরবী অনুবাদ 'আল-হারব ওয়া আল-সালাম' এবং জার্মান শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক গ্যেটে-র বিরচিত *Foust*-এর আরবী অনুবাদও পাঠ করেন।[১২]

নাজীব মাহ্‌ফূয কথাশিল্পী হিসাবে যখন লেখা আরম্ভ করেন তখন তাঁর বিদেশী ভাষায় লিখিত সাহিত্যপাঠ সীমিত ছিল। ধীরে ধীরে তিনি বিদেশী সাহিত্যের পাঠ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করেন। পঞ্চাশের দশকে ফরাসী সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ অনেকাংশে বেড়ে যায়। অতঃপর তিনি ফরাসী ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুঁস্ত (মৃ. ১৩৪১/১৯২২), অনরি দি বালজাক (মৃ. ১২৬৭/১৮৫০), জাঁ পল সার্ত (মৃ. ১২৯৮/১৯৮০), ১৯৫৭ সালের সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ প্রাপক আলবার্ট ক্যামু (মৃ. ১৩৮০/১৯৬০) এবং অন্যান্য প্রখ্যাত লেখকদের উপন্যাস পাঠ করেন। তিনি অস্তিত্ববাদে মুগ্ধ হন এবং ইংরেজী ও মার্কিন সাহিত্য ব্যাপক হারে এবং বিরামহীনভাবে পাঠ করে যান। এ-সময়ে তিনি

আইরিশ ঔপন্যাসিক জেম্‌স জয়েস (মৃ. ১৩৬০/১৯৪১), ইংরেজ সমালোচক ও ঔপন্যাসিক এডলাস হ্যাকসলী (মৃ. ১৩৮৩/১৯৬৩), আমেরিকান নাট্যকার ইউজিন ও' নিল (মৃ. ১৩৭৩/১৯৫৩), আমেরিকান ঔপন্যাসিক ও ১৯৪৯ সালের সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ বিজয়ী উইলিয়াম ফক্‌নার (মৃ. ১৩৮২/১৯৬২) এবং আমেরিকান ঔপন্যাসিক ও ১৯৫৪ সালের সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ প্রাপক আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ে (মৃ. ১৩৮১/১৯৬১) প্রমুখ সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারদের রচনাবলী নিয়মিত পাঠ করেন। তিনি কোলন উইলসনের গ্রন্থ *The Outsider* পড়ে খুবই আনন্দ উপভোগ করেন। পক্ষান্তরে নাজীব জাহিলী ও ইসলামী যুগের কয়েকজন প্রখ্যাত কবির রচনা ব্যতীত পুরাতন আরবী সাহিত্য অধ্যয়নে তেমন মনোনিবেশ করেন নি। তিনি অবসর সময়গুলোতে যে-সব বিদেশী লেখকদের বই পড়তে ভাল বাসতেন তাঁদের মধ্যে রুশ ঔপন্যাসিক ফিওদর মিখাইল দস্তয়েভস্কি (মৃ. ১২৯৯/১৮৮১), ইভান তুর্গেনেভ (মৃ. ১৩০১/১৮৮৩), রুশ নাট্যকার ও কথাশিল্পী আন্তন পাওলভিক চেখব (মৃ. ১৩২২/১৯০৪), ফরাসী ঔপন্যাসিক ও ১৯২১ সালের সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ বিজয়ী আনাতোলি ফ্রাঁস (মৃ. ১৩৪৩/১৯২৪), আদ্রে মার্লো (মৃ. ১৩৯৬/১৯৭৬), ঔপন্যাসিক ও ১৯৫২ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ প্রাপক ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক (মৃ. ১৩৯০/১৯৭০), জার্মান ঔপন্যাসিক হেনরিখ মান্ (মৃ. ১৩৭০/১৯৫০), অস্ট্রিয়ার ঔপন্যাসিক ফ্রানৎস কাফ্‌কা (মৃ. ১৩৪৩/১৯২৪), মার্কিন ঔপন্যাসিক দস্ প্যাসোস্ (মৃ. ১৩৯০/১৯৭০), নাট্যকার টেনিসি উইলিয়াম (মৃ. ১৪০৩/১৯৮৩), নরওয়ের কবি ও নাট্যকার অগাস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ (মৃ. ১৩৩১/১৯২২) প্রমুখ সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাস্তববাদের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলো পড়লেও বাস্তববাদ বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ের একজন প্রতিনিধিত্বশীল ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স (মৃ. ১২৮৭/১৮৭০)-এর প্রভাব মুক্ত ছিলেন। তিনি বাস্তববাদের প্রতিষ্ঠাতা ফরাসী ঔপন্যাসিক বালজাক-এরও কোন উপন্যাস পড়েন নি। মূলতঃ নাজীব তাঁর বর্ণনা পছন্দ করতেন না। তিনি সাহিত্যে স্বাভাবিক বাস্তববাদের প্রতিষ্ঠাতা ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিল জোলা (মৃ. ১৩২০/১৯০২)-এর অনেক উপন্যাস পড়েন এবং তাঁর অনেক উপন্যাস ও ছোট গল্প নাজীবকে বেশ প্রভাবিত করে। এতদ্‌সত্ত্বেও এবং আশ্চর্যের বিষয় হলেও নাজীব জোলার লেখার কোন

গুরুত্ব স্বীকার করতেন না। নাজীব উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখায় তাঁর স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন। ১৯৩০ দশকের গোড়ার দিকে তিনি যে সব ছোটগল্প লেখেন তাতে উল্লিখিত পাশ্চাত্য সাহিত্যের তেমন প্রভাব দেখা যায় না। তাঁর ছোটগল্পগুলোতে প্রুঁস্ত, জয়েস অথবা মান্-এর প্রতিফলন না থাকলেও তাতে মোপাসাঁ-এর স্টাইল এবং কখনো কখনো চেখব-এর স্টাইলের প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া তাঁর ছোটগল্পের সাথে মোপাসাঁ ও চেখবের মিসরীয় শিস্য মাহ্মূদ তাইমূর ও ইয়াহ্ইয়া হাক্কীর স্টাইলের বেশ মিল দেখা যায়। নাজীবের ২৮টি গল্প-সংকলনে আমরা এমন অনেক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই যা মাহমুদ তাইমূরের গল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন, মানসিক ভার-সাম্যহীন জনগোষ্ঠীর প্রতি অতিশয় অনুরাগ, তাদের জীবন পদ্ধতির প্রতি আকর্ষণ এবং সর্বোপরি কায়রোর অবহেলিত লোকদের জীবন প্রণালী ইত্যাদি। এই সময় নাজীব ১৩০টি ছোটগল্প লেখেন, যার মধ্যে ৮০টি প্রকাশিত হয় এবং বাকী ৫০টি তিনি নষ্ট করে ফেলেন। এখানে তাঁর সবকয়টি ছোটগল্প আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে উল্লিখিত সংখক গল্পগুলো তাঁর সাহিত্য জীবন ধারার একটি বিশেষ পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করছে। তাছাড়া তাঁর উপন্যাসে পরবর্তী পর্যায়ে যে-কয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-বস্তুর প্রতি আমরা লক্ষ্য করেছি তা তাঁর ছোটগল্পে প্রথমেই উপস্থিত ছিল বলে মনে হয়। "ইয়াকযাত আল-মুমিআ" (মাম্মির ঘুম ভাঙ্গানো) নাজীবের সামাজিক প্রতিরোধ গড়নে বেশ আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি অদ্বিতীয় ফেরাউনী ছোটগল্প। ছোটগল্পটির দর্শনের সাথে তাওফীক আল-হাকীমের 'আওদাত আল-রুহ্' (আত্মার প্রত্যাবর্তন) উপন্যাসের ঐতিহাসিক উপমাকে তুলনা করা যেতে পারে। এই সময়ের ছোটগল্পগুলোর ত্রিধারী ভয়ঙ্কর বিষয়-বস্তু হলো সময়, পরিবর্তনশীলতা এবং মৃত্যু। এই বিষয়বস্তুগুলো পরে তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসসহ অন্যান্য ছোটগল্প ও উপন্যাসের মেরুদণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। নারী-পুরুষের অশোভন আচরণ ও যৌন-সংক্রান্ত বিষয়ও তাঁর ছোটগল্পগুলোতে স্থান পায়। তাছাড়া অধি-কাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক বিষয়বস্তুও এই সব ছোটগল্পে প্রাধান্য লাভ করেছে। কায়রোর দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি নাজীবের কৌতূহল অবি-চ্ছেদ্য ছিল না, বরং তা মাহ্মূদ তাইমূরের মৌলিক শক্তির চেয়েও

অধিক সংগ্রামী ছিল। এ ধরনের লোকদের দুঃখ ও দুর্দশা প্রচণ্ড আবেগ ও তিক্ততার সাথে অংকন করা হয়। অন্যদিকে ধনিক শ্রেণীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। এই সব ছোটগল্পের বিচারে ধনিক শ্রেণী হলো চরিত্রহীন, অশোভন এবং দুষ্ট প্রকৃতির লোক যারা মিসর জাতির জন্য একটি বড় বোঝা স্বরূপ। নাজীবের কোন ধনী নায়কই একটি বৃত্তাকার চরিত্র ছিলনা। যখন একটি গল্পে ধনী ও গরীবের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, তখন সব সময় গরীবের পক্ষেই মতামত পাওয়া যায়।[১৩]

১৯৩৯ সাল নাজীবের চাকুরী ও সাহিত্যিক জীবনের অগ্রগতির একটি পরিবর্তন চিহ্নিত করে। এ বছর তিনি ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়ে একজন কর্মকর্তা হিসাবে সরকারী চাকুরীতে যোগ দেন। এখানে তিনি প্রায় পনেরো বছর চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন। মন্ত্রণালয়ের ইসলামী বিষয়ের দায়িত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করার সময় তিনি মুসলিম জীবন প্রণালী ও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অবগত হন। তাছাড়া তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে আমরা একজন নিম্নপদস্থ সরকারী চাকুরের সাথে সাক্ষাৎ করছি এবং কিছু নির্দিষ্ট কাহিনী ব্যতিরেকে প্রকৃতপক্ষে এইসব উপন্যাসের অধিকাংশই কিছু সরকারী দপ্তরকে কেন্দ্র করে রচিত। ১৯৩৯ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আবছ আল-আকদার' (ভাগ্যের পরিহাস) প্রকাশিত হয় যা তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোর ধারাবাহিক প্রকাশনার সূচনা করে। আল-মানফালূতীর ছোটগল্পের ন্যায় আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদের উপন্যাসও নাজীবকে বেশ প্রভাবিত করে। তিনি তাঁর শিক্ষক আল-আক্কাদের 'সারা' উপন্যাসটিকে আরবী ভাষায় লিখিত প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের নমুনা হিসাবে পেয়েছেন। উপন্যাস-টির দূরদৃষ্টি ও লেখকের রচনা-শক্তি তাঁকে বিশেষ ভাবে অভিভূত করে। সম্ভবতঃ আল-আক্কাদই একমাত্র কবি যাঁর সব কয়টি কবিতা সংকলন (দীভান) তিনি পড়েন। ত্বাহা হোসাইনের অবাধ্য চিন্তাধারার মূলমন্ত্রও তিনি শিখেছেন। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভাবের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সমসাময়িক মিসরীয় সাহি-ত্যিকদের মধ্যে নাজীবকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা যায়। তাঁকে সামাজিক শ্রেণীর ব্যাখ্যায় একজন অধিক দক্ষ কথা-সাহিত্যিকরূপে

অভিহিত করা যায়। তিনি সংঘবদ্ধ সমাজ দলের ভাবমূর্তি ও সম্পর্ক বিশ্লেষণের বাস্তবচিত্র অনুভূতিশীল দর্পণে প্রতিফলন ঘটান। আরব বিশ্বের রাজনৈতিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ হলেও আরবদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁর নিরপেক্ষ ভূমিকার জন্য তিনি একজন বিতর্কিত ঔপন্যাসিক হিসাবে চিহ্নিত। অনেক ঔপন্যাসিক তথা সাহিত্যিকের ন্যায় তিনিও অনুবাদকর্মের মাধ্যমে আধুনিক ইউরোপকে পর্যালোচনা করেছেন। ইতিপূর্বে স্কুলের প্রাইমারী ও মাধ্যমিক পর্যায়ে তিনি উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের (মৃ. ১০২৫/১৬১৬) বেশ কয়েকটি নাটক বিশেষ করে 'কিং লীয়ার' 'হ্যামলেট', এবং 'ওথেলো' পাঠ করে খুবই মুগ্ধ হন। তিনি তাঁর উপন্যাসে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উপাদানের উপর অধিক গুরুত্ব দেন। একই যুগের ঔপন্যাসিকদের রচনায় পরস্পরের লেখার যথেষ্ট প্রভাব দেখা গেলেও তাঁর উপন্যাসে অন্যের প্রভাব সরাসরি নেই বললেই চলে। মূলতঃ মিসর সহ সারা বিশ্বের প্রবহমান ঘটনাবলী নাজীবের জীবন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে গভীরভাবে দোলা দেয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা নৈরাশ্যজনক এবং তাঁর এই সময়কার সাহিত্য-কর্মগুলো অদৃষ্টবাদী ও হতাশাযুক্ত। মিসরীয় সমাজের সামাজিক বিরোধ, রাজনৈতিক দলগুলোর পতন, মিসরের উপর অক্ষশক্তির বিমান হামলা, হিটলারের নাজী আক্রমণের ভয়াবহতা ইত্যাদি তাঁর অন্তরকে আতঙ্ক ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ করে। তবে তিনি একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে নিজকে বিরত রাখেন এবং একজন সমাজ-সচেতন পণ্ডিত-ব্যক্তি হিসেবে বিপ্লবী সাহিত্য-সৈনিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই সময় ঔপন্যাসিক আনিল কাদিল (জ. ১৩৩৫/১৯১৬)-এর সাথে তাঁর বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হয়। অবশ্য তিনিও নাজীবকে তাঁর বিষণ্ণতা থেকে মুক্ত করতে পারেন নি। কামিলের সাহিত্যকর্ম ব্যাঙ্গাত্মক ও আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদে চিহ্নিত ছিল। কামিল নিজেও নৈরাশ্যবাদী ছিলেন। নাজীবের অন্য এক বন্ধু আহমদ যাকী মাখ্লুফও নৈরাশ্যবাদী ছিলেন। নাজীব তাঁর এই দুই বন্ধুসহ জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করে বিকালের সময় প্রায়ই কাটাতেন। তাঁরা জালা সেতুর খোলা এলাকায় প্রায়ই বৃত্তাকারে বসতেন। তাঁদের সাহিত্যিক পরিশ্রমের মূল্যায়ন

ও উপকারিতা সম্পর্কে তাঁরা সন্দিহান ছিলেন। কামিল ও নাজীব উভয়ই কথাসাহিত্যে নিবেদিত-প্রাণ ছিলেন। তাঁরা ফিরাউনী ইতিহাসের ভিত্তিতে উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখতে ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁদের বন্ধু বাকাসীর ও আল-সাহ্যার আরবী ও ইসলামী ঐতিহ্যে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। কামিল ও নাজীব উভয়ই সালামা মূসার সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার অংশীদার ছিলেন এবং প্রথমে ফিরাউনী উপন্যাস এবং পরে সমসাময়িক ঘটনা-কেন্দ্রিক উপন্যাস লিখেন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালে মিসরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপন্যাস লেখার একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করে। সর্বমোট ৬৬ জন ঔপন্যাসিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। বিচারকমণ্ডলী কর্তৃক নাজীবসহ ১৫ জনের দরখাস্ত বিবেচনার জন্য বাছাই করা হয়। মিসরীয় প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের সমন্বয়ে আরবী ভাষা একাডেমী কর্তৃক মনোনীত বিচারকমণ্ডলী এঁদের কাউকে প্রথম প্রাইজ না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এঁদের মধ্যে নাজীব-সহ পাঁচ জনের নাম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসাবে নির্বাচন করা হয়। এই পাঁচ জনের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে তিন জন উপন্যাস রচনায় প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁরা হলেন আদিল কামিল—তাঁর উপন্যাস 'মালিক মিন শুআ' (আলোক রশ্মির রাজা), আলী আহমদ বাকাসী,—তাঁর উপন্যাস 'ওয়াইসলামাহ্' (ও' মুসলিম) এবং নাজীব মাহফূয,—তাঁর উপন্যাস "কিফাহ্ তীবা" (থিবেস বাসীদের সংগ্রাম) উপস্থাপন করেন। তাঁরা তিন জনই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। নাজীব ৪০ পাউণ্ডের একটি প্রাইজ পান। উপন্যাস প্রতিযোগিতার বিজয় তাঁদেরকে আরো উৎসাহিত করে। অতঃপর নাজীব ১৯৪৩ সালের একাডেমী প্রতিযোগিতায় তাঁর উপন্যাস 'আল-সারার' (মরীচিকা) উপস্থাপন করেন। এবার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর উপন্যাসটি প্রত্যাখ্যান করা হয়। এতে তিনি নিরাশ না হয়ে পূর্ণ উদ্যমে উপন্যাস লিখে যান। তিনি লেখার বিনিময়ে অন্য কিছুর আশা করেন নি ; সাহিত্য সেবাই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। প্রথমেই তিনি স্যার ওয়ালটার স্কটের অনুকরণে সমস্ত ঐতিহাসিক দৃশ্য অংকনের মাধ্যমে ত্রিশ অথবা চল্লিশটি উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। এখন তিনি শুধু সমসাময়িক ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করছেন। ১৯৪৫ সালে তিনি তাঁর কায়রো-উপন্যাসের প্রথম সিরিজ 'খান আল-খালীলী'

(খান আল-খলীলী এলাকা) প্রকাশ করেন এবং পরবর্তী দুই বছরে 'আল-কাহিরা আল-জাদিদা' (আধুনিক কায়রো) এবং 'যুকাক আল-মিদাক্ক' (মিদাক গলি) প্রকাশ করেন। তাঁর উপন্যাস তিনটি মিসরের উল্লেখযোগ্য সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তদানীন্তন মিসরের উদীয়মান সমালোচক ও কোরানের পণ্ডিত সৈয়দ কুতুব নাজীবের এই তিনটি উপন্যাসকে আধুনিক আরবী কথা-সাহিত্যের উৎস বলে বর্ণনা করেন এবং উপন্যাসগুলোর রচিয়তাকে পর্যাপ্ত স্বীকৃতি না দেয়ার কারণে মিসরের সাহিত্য-সমালোচকদের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি নাজীবের কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রকে তাওফীক আল-হাকীমের নাটকের প্লটের সাথে তুলনা করেন। সৈয়দ কুতুব তাঁর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে আরো বলেন যে, নাট্যকার তাওফীক আল-হাকীম সূচনাতেই ত্বাহা হোসাইনের সাহিত্য দর্শন অনুকরণ করেন, কিন্তু ঔপন্যাসিক নাজীব তা করেন নি। অন্য একজন সাংবাদিক ও সমালোচক আনোয়ার আল-মা'আদ্দাভীও কায়রো-উপন্যাসের প্রতি বিশেষ ভাবে মনোযোগী হন এবং নাজীবের 'বিদায়া ও নিহায়া' (সূচনা ও সমাপ্তি) উপন্যাসকে একটি নিখুঁত শিল্পকর্ম বলে বর্ণনা করেন। তাঁর কায়রো-উপন্যাস লেবানন ও ইরাকসহ অন্যান্য আরব দেশের সমালোচক ও পাঠকসমাজে ব্যাপক সমাদৃত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তাঁর উপন্যাস এক যুগ ধরে আরবী কথা-সাহিত্যের একটি মাইলস্টোন বলে চিহ্নিত হয়নি।[১৪]

মূলতঃ নাজীব মাহ্‌ফূয ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে কোন বই প্রকাশ করেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি ১৯৫২ সালে তাঁর সর্ববৃহৎ উপন্যাস 'আল-সুলাসিয়্যাত' (ত্রয়ী উপন্যাস বা ট্রিলজী)-এর লেখার কাজ শেষ করেন। এই উপন্যাসের তিনটি খণ্ড ১২ শত পৃষ্ঠার এবং এর ইংরেজী অনুবাদ "ট্রিলজী"-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫ শত (যার শব্দ সংখ্যা হলো তিন লক্ষ)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ সময় পর্যন্ত কায়রোর একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের তিনটি ধারাবাহিক প্রজন্মের পৃথিবীকে নবরূপে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে উপন্যাসটি লেখা হয়। তিনি আরবী সাহিত্যের এই তুলনা-বিহীন পরিকল্পনাটি অফিসের কাজের শেষে অবসর সময়ে সম্পন্ন

করেন। উপন্যাসটির ঐতিহাসিক তথ্য, তারিখ, জনগণ এবং ঘটনাবলীর অনুসন্ধানে তিনি প্রাথমিকভাবে প্রায় এক বছর এবং লেখার জন্য প্রায় ছয় মাস ব্যয় করেন। এই সময় তিনি ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন ধরনের তদন্তের জন্য যখন তখন বাইরে যেতেন বলে লেখার কাজে অনেক বাধা পড়ে। তাছাড়া যন্ত্রণাদায়ক চক্ষু রোগ ও চর্ম রোগে তিনি ভুগছিলেন বলে প্রতি বছর শুধু সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল মাসের দিনগুলোতে তিনি লেখার কাজ করতে পারতেন। ত্রয়ী-উপন্যাস নাজীবের সাম্প্রতিককালের সাফল্য বয়ে আনে এবং বিশ্বের সমালোচকগণ এটাকে যুগের উপন্যাস বলে দাবী করেন। ১৯৫৭ সালে উপন্যাসটি তাঁর জন্য সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় প্রাইজ বয়ে আনে। এই সময় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। তিনি বিবাহ করেন এবং পরে দুই কন্যার জনক হন। তিনি তাঁর পেশাগত জীবনেরও পরিবর্তন করেন এবং শিল্পকলা বিভাগে একটি চাকরীও নেন। ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে তিনি প্রথমে রাষ্ট্রীয় সিনেমা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং পরে সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে একটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন এবং এক পর্যায়ে লেখা বাদ দেয়ার চিন্তা করেন। ১৯৫২ সালে মিসরের স্বাধীনতা বিপ্লবের প্রাক্‌কালে তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের লেখা শেষ হয়। তিনি আর পুরাতন সমাজের সমালোচনার পক্ষপাতী থাকলেন না। তিনি বাদশা ফারুকের অন্যায় শাসন ব্যবস্থার অফিসারদেরকে মিসরীয় সমাজের একটি বৈপ্লবিক শক্তি মনে করেন। বাদশা ফারুকের শাসনামলে বিপ্লব ও সামরিক অভ্যুত্থানের পর্ব পর্যন্ত মিসরের যে সমাজগঠন ছিল তার তখন বিলুপ্তি ঘটে। অধিকাংশ স্বাধীনচেতা ও বামপন্থী পণ্ডিত সূচনা-লগ্নেই অভ্যুত্থানকে সমর্থন করতে পারেননি। অভিশপ্ত রাজার পতনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে সামরিকবাহিনী কর্তৃক সব ধরনের দমননীতির কারণে তাঁদের আনন্দ স্তব্ধ হয়ে যায় এবং অনেক পণ্ডিতই এর নিরব প্রতিবাদ জানান। ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে নাজিব একজন ভিন্নধর্মী লেখক-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম বিশেষ করে 'আওলাদ হারাতিনা' (আমাদের এলাকার ছেলে-মেয়ে) সরাসরি আঘাতের মাধ্যমে একটি নতুন জীবন দর্শন প্রকাশ করে। উপন্যাসটি

লেখকের একটি শৈল্পিক উপস্থাপনা মাত্র। তাঁর মধ্যে এই সময় একটি নতুন দর্শন দানা বেঁধে উঠে। তাঁর এই নতুন দর্শন তাঁকে আধ্যাত্মিক ও অতি-প্রাকৃতিক একটি শক্তিতে বিশ্বাসী করে তোলে। এই ধরনের একটি বিশ্বাস কেবল প্রায়শ্চিত্ত, ভালবাসা এবং জ্ঞানের দ্বারই অর্জন করা যেতে পারে। তবে বাস্তবে এই ধরনের উদ্দেশ্য কারো জন্যই সুফল বয়ে আনেনা। কারণ বর্তমান সমাজ লোভ, দুঃখ-দুর্দশা ও শোষণ মুক্ত নয় এবং যা মানুষের মনকে অবশ্যই কলুষিত করে। পরিষ্কার মন সৃষ্টির মাধ্যমেই কেবল মানুষ আল্লাহকে পেতে পারে। নাজীব যে জীবন পদ্ধতির কামনা করছেন তাকে তিনি সূফী-সমাজতন্ত্র বলে বর্ণনা করেন। এই ধরনের দর্শন মিসরের সূফী মতবাদের সাধারণ প্রবণতার পরিপন্থী। মূলতঃ তাঁর ষাট দশকের উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলো বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস থেকে আরো দূরে সরে যায়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি যে সব গ্রন্থ লেখেন তা সূফী অথবা অর্ধ সূফী লেখকদেরকে কেন্দ্র করে রচিত। ১৯৬৬ সালের পর তিনি পাঁচটি বই লেখেন যাদের মধ্যে শুধু 'মীরামার' ও 'আল-মারায়া' ছিল উপন্যাস আর বাকী ছিল ছোটগল্প। 'মীরামার' উপন্যাসের পর তিনি ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ছোটগল্পের চারটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ছোটগল্পগুলোর স্টাইল ও বিষয়বস্তু ভিন্ন ধরনের ছিল। ১৯৭২ সালে সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি নিয়মিত লিখেই যাচ্ছেন। নাজীবের মধ্যে আমরা আধুনিক আরবী-সাহিত্যের একজন পরিপূর্ণ ঔপন্যাসিকের সন্ধান পাচ্ছি এবং তাঁর মাধ্যমে মিসর বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ নতুন ধারার সূত্রপাত করেছে।[১৫]

আজ পর্যন্ত নাজীব মাহ্‌ফূযের কথা-সাহিত্যের যতগুলো গ্রন্থ লেখা ও প্রকাশিত হয়েছে তাদেরকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ের লেখায় মিসরীয় সমাজ জীবনের একটি সঠিক ও পরিপূর্ণ প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়। ১৯৫৭ সালে ত্রয়ী উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত এই পর্যায়ের বিস্তার ঘটেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখায় অধিবিদ্যার যথেষ্ট ছাপ ও নিদর্শন রয়েছে। ১৯৫৯ সালে তাঁর উপন্যাস 'আওলাদ হারাতিনা'-এর প্রকাশ কাল থেকে ১৯৬৬

সালে তাঁর উপন্যাস 'সার সারা ফাওক আল নীল' (নীল নদের পিঠে খোশ গল্প)-এর প্রকাশকাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের বিকাশ ঘটেছে। তৃতীয় পর্যায়ের লেখায় সামাজিক বিষয়বস্তু পুনরায় সিংহসাহস নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করে। ১৯৬৭ সালে তাঁর উপন্যাস 'মীরামার'-এর প্রকাশনা থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়ের বিস্তার। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে মিসরের পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধের একটি সচিত্র প্রতিবেদন তিনি 'মীরামার' উপন্যাসে তুলে ধরেন। দুই একটি উপন্যাস ও নাটক ব্যতীত তৃতীয় পর্যায়ের অন্তভুক্ত বাকী সব কয়টি লেখাই ছোটগল্প। ১৯৩২ সালে ছাত্র জীবন থেকে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি লেখা শুরু করেন এবং আজ পর্যন্ত নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন। আরবী ঐতিহ্য নিয়েই তাঁর লেখা পড়া এবং এখানেই তাঁর মূল পাণ্ডিত্য। তিনি ক্লাসিক্যাল আরবী লেখকদের লেখা নিয়মিত পড়েন এবং লেখায় নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখেন। ১৯৭১ সালে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর থেকে তিনি আজ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবারে "শুক্রবার সাহিত্য চক্র" নামে একটি সাহিত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছেন। তাঁর মতে একজন লেখকের হৃদয়ে প্রথম তাঁর বিপ্লব শুরু হয় এবং পরে জনগণের সংগে সংযোগ ঘটে। মিসরের নিম্ন মধ্যবিত্তদের অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে মিসরের স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাআদ যগলূল পাশার নেতৃত্বে সফল হয়। ইংরেজদের হাত থেকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকুরীগুলো মিস-রের নিম্ন মধ্যবিত্তদের হাতে চলে আসে যা ১৯৩০ ও ১৯৩৪ সালের মধ্যে মিসরের অর্থনৈতিক সংকটের কারণে আবার বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় ইসমাইল সিদকী মিসরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। নাজীব এইসব সংকটের একটি সচিত্র-প্রতিবেদন তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে তুলে ধরেন। তিনি তাঁর লেখক জীবনের শুরুতেই সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি এসেছেন। তাঁর লেখায় কায়রোর জনাকীর্ণ অলি-গলির জীবন প্রতিফলিত হয়। বিগত ত্রিশ বছর যাবৎ তিনি কায়রোর উপকণ্ঠে কিরশা নামক একটি কফি হাউজে নিয়মিত আসা যাওয়া করতেন। এর মধ্যে একদিনের জন্যও বৈকালিক আড্ডায় তিনি অনুপস্থিত থাকেননি। এর মাধ্যমে তিনি কায়রোর সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ কষ্ট, প্রেম–ভালবাসা, ঘৃণা, ক্ষোভ-ক্রোধ, হিংসা-প্রতিবাদ ইত্যাদির

সাথে পরিচিত হন। তিনি একজন সতর্ক আলোকচিত্র শিল্পীর ন্যায় মনের ক্যামেরায় সে সব ধরে রাখেন এবং পরে তা নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রকাশ করেন। তিনি সাধারণ মিসরবাসীদের ন্যায় জীবনসংগ্রাম করে বেঁচে আছেন। অঢেল অর্থবিত্ত তাঁর নেই, কিন্তু আছে একটি স্পর্শকাতর শিল্পী-মন। এঁই মনের তুলিতে তিনি মানব জীবনের বিচিত্র কাহিনী নিরলস ভাবে এঁকে চলেছেন। তিনি দক্ষ কারিগরের ন্যায় তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে ধনী ও গরীবের সংঘাতের একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর প্রথম জীবনের রচনায় প্রাচীন মিসরের মর্যাদা ও স্থান নির্দেশিত হলেও সেগুলো প্রাথমিক দৃষ্টিতে আধুনিক সমাজ জীবনকে ধারণ করে অগ্রসর হয়। তাঁর লেখায় ত্রিশ দশকের মিসরীয় রাজতন্ত্র, সমকালীন রাজতন্ত্র, বৃটেনের আধিপত্যবাদ ও সামাজিক অবস্থার কঠোর সমালোচনা রয়েছে। ১৯৫২ সালে বাদশাহ ফারুকের অপসারণ ও বহিষ্কারের পর তাঁর লেখায় রাজনৈতিক ভাব-ধারা তেমন দেখা যায় না। তিনি ফেরাউনের ইতিহাস সম্পর্কিত উপন্যাস-লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং ঐতিহাসিক-উপন্যাস লেখাকে তিনি পরিপূর্ণ শিল্পের রূপ দেন। তাঁর সব কটি উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা, চরিত্র চিত্রায়ণের চাতুর্য, রচনাশৈলীর কৌশল এবং বিষয়বস্তুর চমৎ-কারিত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বলার অপেক্ষা না থাকলেও সামগ্রিক ভাবে বলা যায় যে, তিনি মিসরকে তাঁর সূক্ষ্ম অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর রচনায় আছে মিসরের অতীত ইতিহাস, সংস্কার-বদ্ধ সামাজিক জীবন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিসরের পরিগতি, হিটলারের নাজী বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা, জার্মানীদের বিমান হামলার প্রচণ্ড রূপ, কর্ণেল নাসিরের আমলের বিপ্লব, বাদশাহ্ ফারুকের স্বৈরাচারী শাসনামলের বিভীষিকা, অত্যাচার, অবিচার ও নিপীড়ন, ইউরোপীয় অপসংস্কৃতির অনুকরণপ্রিয়তা এবং এর ভয়াবহতা ইত্যাদি। তিনি ৪০টি উপন্যাস, ১৫টি ছোটগল্প সংকলন ও কয়েকটি নাটক রচনা করেন। তাঁর বেশ কয়টি রচনা ইংরেজী, ফরাসী ও রুশ ভাষায় অনু-দিত হয়। ফলে আরবী ভাষার পাঠক সীমিত হলেও অনুবাদের মাধ্যমে তিনি আরব ভূণ্ডের সীমানা পেরিয়ে আরো বৃহত্তর জগতে প্রবেশা-ধিকার লাভ করেন। তাঁর কয়েকটি উপন্যাসকে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও মঞ্চ নাটকে রূপ দেয়া হয়েছে। মিসরের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক

হানী লাসিন নাজীবের উপন্যাস অবলম্বনে চারটি চলচ্চিত্র তৈরী করেছেন। পরিচালক ১৯৮৩ সালে নাজীবের 'আয়্যাব' উপন্যাস অবলম্বনে তাঁর প্রথম ছবি তৈরী করেন। এর কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন মিসরের খ্যাতিমান অভিনেতা উমর শরীফ। ফুটবল নাজীবের শখের খেলা ছিল। তিনি সেন্টার হাফে খেলতেন। বর্তমানে তিনি নীল নদের তীরে প্রতিদিন সকাল ও বিকাল দু'বার আল-তাহরীর পার্ক হতে আল-আব্বাস সেতু পর্যন্ত পায়চারী করেন। তিনি এখনো অনবরত লিখছেন এবং তাঁর স্ত্রী আতিয়্যাহ তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করছেন।[১৬] মূলতঃ নাজীব মাহ্‌ফূয ১৯৮৮ সালে তাঁর কথা-সাহিত্য বিশেষ করে ত্রয়ী উপন্যাস সহ 'যুকাক আল-মিদা' ও 'সারসারা ফাওক আল-নীল' উপন্যাসের জন্য সুইডিস একাডেমী কর্তৃক আরবী সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। তিন খণ্ডে রচিত হলেও বিষয়বস্তু ও রচনা শৈলীর দিক থেকে উপন্যাসটি এক ও অভিন্ন। উপন্যাসের বিভিন্ন অংশ ও খণ্ড মিসরের পুরাতন অলি-গলি, বাসস্থান ও উপকণ্ঠের নামে নামকরণ করা হয়েছে। প্রতিটি রাস্তা ও অলিগলি কায়রোর বিখ্যাত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং আল-হোসাইন মসজিদ সংলগ্ন। বর্তমানে নাজীবের বয়স ৭৮ বছর।

নিম্নে নাজীব মাহ্‌ফূযের প্রকাশিত ও যন্ত্রস্থ উপন্যাস ও ছোটগল্প-সংকলনের একটি বর্ণনামূলক তালিকা দেয়া হলো :[১৭]

১. মিস্‌র আল-কাদিমা (প্রাচীন মিসর) : কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রে কলা অনুষদে ২য় বর্ষ স্নাতক ডিগ্রীতে পড়ালেখার সময় নাজীব মাহ্‌ফূয ইংরেজী ভাষা থেকে James Baike এর *Ancient Egyyt* (London, 1912) নামক একটি বই আরবীতে অনুবাদ করেন। মূলতঃ ইংরেজী বইটি "Peeps at Many Lands" সিরিজে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর আরবীতে অনূদিত গ্রন্থটি ১৯৩২ সালে সালামা মূসা সম্পাদিত আরবী পত্রিকা "আল-মাজাল্লা আল-জাদীদা"-তে প্রথমে প্রকাশিত হয় এবং পরে একই বছর তা গ্রন্থাকারে ছাপানো হয়। ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য তিনি বইটি অনুবাদ করেন।

২. হাম্‌স আল-জুনূন (পাগলের মাতলামী) : এটা নাজীবের একটি ছোটগল্প-সংকলন। এখানে তাঁর ২৮টি ছোটগল্প স্থান পেয়েছে। গল্পগুলো

হলো : আল-শারিদা (ভবঘুরে), সামান আল-সা'আদা (সৌভাগ্যের মূল্য), নাক্স আল-উম্মাত (জাতির বিরোধিতা), আল-দায়ফ (অতিথি পরিদর্শক), জা'দাহ্ (পরীর বৃত্তাকার নৃত্য), নাহ্নু রিজাল (আমরা পুরুষ), হুস্ন শালদাম (শালদামের সৌন্দর্য), হায়াতু মুখরিজ (পরিচালকের জীবন), কায়দু হান্না (সমবেদনার কৌশল), ইসলাহ্ আল-কুবূর (কবরস্থানের মেরামত), আল-জু' (ক্ষুধা), আল-ওয়ারাকা আল-মাহ্লাকা (বিপদজনক পত্রিকা), বুদলাত আল-আসীর (কয়েদীর পোষাক) ইত্যাদি। মুদ্রিত গ্রন্থটির শেষ পৃষ্ঠা (colophon) অনুযায়ী সংকলনটি ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। এর অন্য একটি সংস্করণ ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়। সংকলনটির দশম সংস্করণ ১৯৭৯ সালে বের হয়।

৩. আবাস আল-আকদার (ভাগ্যের পরিহাস) : এটা নাজীবের একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস যা প্রথমে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয় এবং এর দশম সংস্করণ ১৯৮২ সালে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে তিনি যে তিনটি ফেরাউনী উপন্যাস লেখেন এটা তার একটি। বিভিন্ন কারণে উপন্যাসগুলো যথা সময় ছাপানো হয়নি। উপন্যাসটির ঘটনা প্রবাহ প্রায় খ্রীস্টপূর্ব ছাব্বিশ শতাব্দীর ৪র্থ ফিরাউনী রাজবংশের রাজা খোপো বা Cheops (মৃ. ২৮০০ খৃ. পূ.)-এর সময় ঘটে। "আরব্য রজনীর" টেকনিকের সাথে উপন্যাসটির মিল আছে। প্রধান পুরোহিত "রা"-এর ছেলে দাদাফ (Radjedef)-এর জন্মকাল থেকে প্রথম যৌবনে মিসরের সিংহাসনে আরোহনসহ তার জীবন বৃত্তান্ত এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। উপন্যাসটির লেখা দাদফের জন্মদিনে উদ্বোধন করা হয়। খোপোর মেম্পিসের (Memphis) রাজ প্রাসাদে ফিরাউনের আতঙ্ক সৃষ্টি করে একজন প্রবীন জ্যোতিষী ভবিষ্যৎবাণী করেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কোন সন্তান মিসরের সিংহাসনে আরোহন করবেন না। অধিকন্তু বৃদ্ধ গণক ঘোষণা করলেন যে প্রধান পুরোহিত "রা"এর নবজাত শিশু পরবর্তী ফিরাউন হবে। ফিরাউন ও তার সন্তানেরা এই অশুভ সংবাদ শুনে প্রধান পুরোহিতের নবজাত শিশুকে হত্যা করার জন্য তাঁর জন্মভূমি "অন" (On)-এর উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। ফিরাউনের দলবল তখনই উপস্থিত হয়, যখন শিশু

ও মা চাকরানী "যায়াহ"-সহ "অন" ত্যাগ করে। তবে ফিরাউন বাহিনী চাকর "কাতা"-এর ছেলেকে পুরোহিতের ছেলে মনে করে হত্যা করে। কেননা সে ও পুরোহিতের ছেলে একই দিনে জন্ম গ্রহণ করেছিল। এই দিকে নিঃসন্তান চাকরানী যায়াহ্‌ শিশুটির মাকে মরু-ভূমিতে একা ফেলে শিশুটিকে অপহরণ করে এবং পরে শিশুটির মাও সিনাই গোত্রের লোকজন কর্তৃক অপহৃতা হয়। ফিরাউন নিখোঁজ যায়াহ্‌ ও শিশুটিকে মরুভূমি থেকে কুড়িয়ে রাজধানী মেম্পিসে নিয়ে আসেন। যায়াহ র স্বামী দীর্ঘদিন যাবৎ পিরামিড নির্মাণের কাজ করতো। সে দেখলো যে, তার স্বামী ইতিপূর্বে মারা গিয়েছে। তখন থেকে যায়াহ্‌ শিশুটিসহ পিরামিড সুপার বিশারো-এর কাছে লালিত পালিত হতে থাকে। শিশু দাদাফ ১২ বছর বয়সে সৈনিকের জীবন বেছে নেয়। সামরিক শিক্ষানবিস হিসাবে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেয়াতে রাজকুমার তাকে তাঁর দেহরক্ষী নিয়োগ করেন। এক সময় নীল নদের সৈকতে ফিরাউনের কন্যা মেরীসী আংখ-এর সাথে দাদাফের ছদ্ম প্রণয় ঘটে। রাজকুমারের দরবারে দাদাফ দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। বিশ বছর বয়সে দাদাফ একটি শিকারের দুর্ঘটনা থেকে রাজকুমারীর জীবন রক্ষা করলে রাজকুমার তাঁকে দেহরক্ষী বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেন। এর পর শীগ্রই ফিরাউন তাঁকে সিনাই গোত্রের দস্যুদেরকে বিতাড়িত করার জন্য একটি সৈন্যবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। যুদ্ধের প্রাক্‌কালে রাজকুমারী মেরী যুবক সেনাপতির নিকট তাঁর গোপন ভালবাসা ব্যক্ত করে। সিনাই অভিযানে বিজয় ঘটলে দাদাফ অনেক বন্দীদের মধ্যে ৫০ বছরের একজন মিসরীয় মহিলাকেও দেখতে পান। মহিলাটি দাবী করেন যে ২০ বছর পূর্বে সিনাই গোত্রের লোকজন কর্তৃক তিনি অপহৃতা হয়েছিলেন। দাদাফ মহিলাটিকে রাজধানী মোসে নিয়ে আসেন এবং দেখে আশ্চর্য হন যে মহিলাটি তাঁর আসল মা। এই দিকে ফিরাউন তাঁর কন্যাকে বিজয়ী সেনাপতির হাতে তুলে দেয়ার অনুমতি দেন। অপরদিকে যুবরাজ নিরাশ ও অধৈর্য হয়ে তাঁর পিতাকে হত্যা ক'রে সিংহাসনে আরোহন করার ষড়যন্ত্র করেন। দাদাফ ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে তা প্রকাশ করেন নি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরাউনের জীবন রক্ষা করেন। ফিরাউন রোগাক্রান্ত হলেন এবং দাদাফের সতর্কতায় মুগ্ধ হয়ে ঘোষণা করলেন যে তাঁর ভবিষ্যৎ জামাতা দাদাফই হবেন

মিসরের উত্তরাধিকারী রাজা। তবে ফিরাউন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে দাদাফের আসল পরিচয় জানতে পারলেন। ভাগ্যকে প্রতিরোধ করার জন্য ফিরাউনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। তিনি একজন বীর যুবকের হাতে সিংহাসন ছেড়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মারা যান।

৪. রাদূবীস (Rhodopis = সভাসুন্দরী ও রাজনর্তকী) : এই উপন্যাসে নাজীব রাজা ফিরাউন দ্বিতীয় মারানরা-এর স্বল্পকালীন রাজত্বের বর্ণনা দিয়েছেন। দ্বিতীয় মারানরা শুধুএকবছর মিসরের রাজা ছিলেন। যুবক ফিরাউন সিংহাসনে আরোহন করার পর থেকে একজন আনন্দবাদী দার্শনিক ও প্রেমিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বলিষ্ঠ, উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তিনি বাদশাহ হওয়ার সথে সাথে পুরোহিতদের সাথে তাঁদের ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তাঁর রাজধানীর বিপরীত দিকে একটি ছোট দ্বীপে রাদূবীস নামে একজন সুন্দরী রাজনর্তকী বা সভাসুন্দরী বাস করতো। তার বিলাসবহুল প্রাসাদে সমাজের শ্রেষ্ঠ লোকজন ভিড় জমাতো। নীলনদের উৎসব দিনে উপন্যাসটির লেখা শুরু হয়। এইদিন রাদূবীস ফিরাউনকে তার প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখে। একই দিনে একটি ঈগল পাখী রাদূবীসের একটি সোনালী ফিতার স্যান্ডেল ছোঁ মেরে নিয়ে ফিরাউনের পায়ের কাছে নিক্ষেপ করে। ফিরাউন রহস্য বোধ করলেন, সেন্ডেলের মালিকের খোঁজ নিলেন এবং অনতিবিলম্বে তার প্রাসাদ পরিদর্শন করলেন। তাৎক্ষণিক ভাবে তিনি রাদূবীসের সংস্পর্শে এসে তার সাথে অধিকাংশ সময় কাটাতে থাকেন এবং তাঁর বাড়ী সাজানোর কাজে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের একটি বিরাট অংক অকাতরে ব্যয় করতে থাকেন। অবশেষে ফিরাউন তার স্ত্রী নিটোক্রিস-এর ভালবাসা শূন্য করে রাদূবীসের প্রাসাদে চলে যান। রাদূবীস তার জীবনপ্রণালী ত্যাগ করে ফিরাউনের প্রতি প্রকৃত ভাবে অনুরক্ত হন। এতে ফিরাউনের ঘনিষ্ট বন্ধু ও দেহরক্ষী সেনাপতি তাহ সহ রাদূবীসের অনেক প্রেমিক নিরাশ ও ক্ষুব্ধ হয়। পুরোহিতগণ তখন অভিযোগ করলো যে তাদের সম্পদ বেশ্যাবৃত্তিতে ব্যয় করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী থেকে অপসারণকৃত প্রধান পুরোহিত খানূম হাতিব সফলতার সাথে মারানরা-এর বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে একটি বিদ্রোহের বীজ বপন করেন। রাদূবীসের পরামর্শক্রমে

ফিরাউন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা চক্রান্ত করেন, যা পুরোহিতগণ তাহ-র সাহায্যে বানচাল করে দেন। সেই দিনটি ছিল নীলনদের উৎসব দিবস। একবছর পূর্বে এমন একটি দিনে উপন্যাসটির কাহিনী লেখা শুরু হয়। উৎসব উদযাপনের উদ্দেশ্যে যে-সব লোক রাজধানীতে একত্রিত হয়েছিল তারা একটি সংগ্রামী জনতায় রূপান্তরিত হলো এবং ফিরাউনও তার উপপত্নীকে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করে। তারা ফিরাউনের পরিত্যক্তা স্ত্রী, সম্ভ্রান্ত ও সাহসী রানী নিটোক্‌রিস-কে প্রীতি সম্ভাষণ জানায়। বিদ্রোহী জনতা রাজার দেহরক্ষীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তারা ফিরাউনের রাজ প্রাসাদে পৌঁছে। বিদ্রোহীদের নেতা ফিরাউনের প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করলে তিনি গুরুতর ভাবে আহত হন। রাজা তাঁর স্ত্রীকে অনুরোধ করলেন যে তাঁকে রাদূবীসের কাছে যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়। রাদূবীসের সঙ্গে দেখা হওয়ার সাথে সাথে ফিরাউন মারা যান এবং রাদূবীসও পরে বিষ পান করে আত্ম-হত্যা করে। ১৯৪৩ সালে উপন্যাসটি কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। এর দশম সংসকরণ ১৯৮১ সালে আত্মপ্রকাশ করে। লেখক এই উপন্যাসে তদানিন্তন মিসরের সমাজ জীবনের ও সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।

৫. কিফাহ্‌ তীবা (মিসরের থিবেসবাসীদের সংগ্রাম) : থিবেস প্রাচীন মিশরের একটি শহর (অথবা বিয়োটিয়ার প্রধান নগরী থিবেস গ্রীসের একটি শহর)। খ্রীস্টপুর্ব প্রায় ষোল শতাব্দীতে বিদেশী গ্রীক লাইন শিপিয়ার্ড রাজা হায়কসোস (Hyksos)-এর মিসর শাসনকালে উপন্যাস-টির কাহিনী সংঘটিত হয়। উপন্যাসটি থিবেসে মিসরবাসীদের সাহায্যে ফিরাউনের পরিবারের সাথে মিসরের থিবেসে গ্রীক অনধিকার প্রবেশ-কারীদের যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় তার কাহিনী বর্ণনা করছে। যুদ্ধের ফলাফল হিসাবে অনধিকার প্রবেশকারীদেরকে মিসর ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং অবিসম্বাদী ফিরাউন আহ্‌মাস (Ahmos, Amosis) মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। উপন্যাসটি তেরো বছর ব্যাপ্ত একটি ঘটনা প্রবাহকে বর্ণনা করছে যা পৃথক তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে স্বদেসীয় ফিরাউনের পরিবারের চরম দুর্দশা তুলে ধরা হয়। আবু ফীসের (Apophis) নেতৃত্বে বিদেশী হায়ক্‌সোসগণ নিম্ন

মিসরের (Lower Egypt) অধিপতি হয় এবং মিসরীয় রাজাগণ শুধু উচ্চ মিসরের (Upper Egypt) শাসন নিয়ন্ত্রণে রাখেন। তাঁরা প্রকৃত পক্ষে হায়কসোসদের সামন্ত হিসাবে শাসন পরিচালনা করতেন। উপন্যাসের প্রাথমিক বিবরণে দেখা যায় যে আবু ফীসের একজন দূত মিসরের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজধানী থিবেসে আগমন করে এবং উচ্চ মিসরের শাসক সীকিনরা (Sekenere)-এর নিকট কয়েকটি অবমাননা-কর অযৌক্তিক দাবী উপস্থাপন করে। দাবীগুলো সম্পূর্ণরূপে মিসরের সার্বভৌমত্বের বিরোধী ছিল। আবু ফীসের বাহিনীর সাথে ফিরাউনের বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ফিরাউনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ফিরাউনের পরিবারবর্গ থিবেস ত্যাগ ক'রে পার্শ্ববর্তী সুদানের নুবিয়ায় আশ্রয় নেন। ফলে সমস্ত দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকা জবরদখল-কারী বিদেশী হায়কসোস শক্তির হাতে চলে যায়। উপন্যাসটির দ্বিতীয় অংশ শুরু হয় দশ বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে। এই সময় আমরা দেখতে পাই যে মিসরের স্বাধীনতা আন্দোলনের আগুন তখনও নেভেনি। সময় নষ্ট না করে ফিরাউনের পরিবারবর্গ প্রয়াত ফিরাউনের ছেলে কামূস (Kamose)-এর নেতৃত্বে নুবিয়ায় একটি গুপ্ত বাহিনী গঠন করে। কামূসের ছেলে আহ্‌মাস একজন ধনী ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে মিসর ও নুবিয়ার মধ্যবর্তী সুরক্ষিত সীমান্তে প্রবেশ করেন। স্বল্প মূল্যের উপহার ঘুষ প্রদান ও প্রতারণার মাধ্যমে আহ্‌মাস থিবেসের গভর্নরের দরবারে পৌঁছার ফন্দি আঁটেন। সমুদ্রগামী জাহাজযোগে মিসরে সরাসরি আসার জন্য তিনি হায়কসোসের রাজার নিকট থেকে একটি লাইসেন্স সংগ্রহ করেন। এই লাইসেন্সের মাধ্যমে তিনি দেশপ্রেমিক মিসরবাসীদেরকে নিয়ে ফিরাউনের একটি সুসজ্জিত বাহিনী গঠন করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে নুবিয়ায় নিয়ে যেতে সমর্থ হন। তিনি অত্যাচারিত মিসরবাসীদের মধ্যে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে একটি চাপা ক্ষোভ দেখতে পান এবং তাদেরকে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতও দেখতে পান। আহ্‌মাস তাঁর বিপদজনক মিশন পরিচালনার সময় হায়কসোস রাজার সুন্দরী কন্যা আমিনরীদিস-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন। উভয়ই পরস্পরের সান্নিধ্যে আসেন। আহ্‌মাস একটি মল্লযুদ্ধে একজন হায়কসোস অফিসারকে আহত করার পর নিশ্চিত মৃত্যু থেকে তিনি

আমিনরীদিস কর্তৃক রক্ষা পান। উপন্যাসটির তৃতীয় অংশে নুবিয়া থেকে মিসরের উপর ফিরাউন বাহিনীর আক্রমণের প্রস্তুতি শেষ হয়। এই সময় কামূসের বাহিনী স্থল ও নৌ যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হয়। তাঁর বাহিনী অতর্কিত হামলার মাধ্যমে সীমান্ত দুর্গ অধিকার করে এবং উত্তর দিকে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। উচ্চ মিসরের শহরগুলোর একের পর এক তাদের হাতে পতন ঘটে এবং সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বেশ কয়েকটি নতুন শহর বিজেতাদের সারিতে মিলিত হয়। তবে একটি যুদ্ধে কামূস নিহত হলে তাঁর ছেলে আহ্‌মাস ফিরাউন বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। তাঁর বাহিনীর হাতে একটি ভয়াবহ যুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজধানী থিবেসের পতন ঘটলে ফিরাউনের পরিবারবর্গ হায়কসোসদের থেকে সমস্ত মিসর মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত শহরে প্রবেশ কবতে অস্বীকৃতি জানালেন। থিবেসে আনীত হায়কসোসের বন্দীদের মধ্যে আহ্‌মাস সুন্দরী আমিনরীদিসকে দেখে তাকে জনগণের ক্রোধ থেকে উদ্ধার করেন। আমিনরীদিস আহ্‌মাসের সাথে গাম্ভীর্যপূর্ণ ঘৃণ্য আচরণ করেন এবং তাঁর সাথে অন্য কোন সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন। মিসরীয় বাহিনী হায়কসোসের উত্তরাঞ্চলীয় এলাকার উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে। আবু ফীস সংগে সংগে ব্যবস্থা নেন এবং সুরক্ষিত হায়কসোস রাজধানী হুয়ারিস (Avaris)-এর মধ্যে তিনি অবরুদ্ধ হন। এর ভেতর অনুপ্রবেশ জটিল মনে করে আহ্‌মাস নীলনদের প্রবাহ অন্যদিকে দেওয়ার জন্য খাল খননের মাধ্যমে শহরের পানির লাইন কেটে দেন। বিদেশী হায়কসোসবাসী তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মিসর ত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বিশ হাজার মিসরীয় বন্দীর বিনিময়ে আমিনরীদিসকেও নিয়ে যাওয়ার শর্ত আরোপ করে। মিসরবাসী তা গ্রহণ করে। আমিনরীদিসকে পাঠানোর পূর্বে আহ্‌মাস তাঁকে স্বাধীন করে দেন। যুবক ফিরাউনের প্রতি সুন্দরী আমিনরীদিস তাঁর ভালবাসা বিনিময় করেন। তাঁদের প্রেম ব্যর্থ হয়, কারণ দাম্ভিক আবুফীস তাঁর কন্যাকে শত্রুর হাতে কখনও তুলে দিতে চাননি; হায়কসোসরা শ্বেতাঙ্গ ছিলেন এবং মিসরবাসীরা পিঙ্গল বর্ণের। তাঁরা মিসরবাসীদেরকে কৃষক ও নিজেদেরকে রাজা মনে করতেন এবং সিংহাসন, রাজত্ব, শাসন ও ভূমির মালিকানা তাঁদেরই মনে করতেন। উপন্যাসটি ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয় এবং এর দশম সংস্করণ ১৯৭৯ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

৬. আল-কাহিরা আল-জাদীদা (আধুনিক কায়রো): উপন্যাসটি 'খান আল-খালীলী' উপন্যাসের পূর্বে লেখা হলেও ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। 'আল-কাহিরা-আল-জাদীদা' উপন্যাসটি 'ফাদীহা কী আল-কাহিরা' শিরোণামেও প্রকাশিত হয়; উপন্যাসটির দ্বাদশ ও শেষ সংস্করণ ১৯৮৪ সালে বের হয়। উপন্যাসটিতে ১৯৩০ সালের মিসরের দৃশ্যের অবতারণা করা হয়। উপন্যাসটির প্রথম দিকে আমরা শেষ বর্ষের তিন জন দর্শনের ছাত্রের সাথে সাক্ষাৎ পাচ্ছি। তাঁরা হলেন আলী ত্বাহা, মামূন রুদওয়ান এবং মাহ্জূব আব্দ আল-দাইম। আলী ত্বাহা বিত্তশালী পরিবারের একজন সুরুচিপূর্ণ যুবক ছিলেন। তিনি জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ধর্মীয় গুপ্ত রহস্যাদির চেয়ে বিজ্ঞান, স্বর্গের চেয়ে সমাজ এবং অর্থ-নৈতিক প্রতিযোগিতার চেয়ে সমাজতন্ত্রে বেশী বিশ্বাস করতেন। একজন তামাক উৎপাদক দরিদ্র কৃষকের সুন্দরী কন্যা ইহসান তাঁর বান্ধবী ছিলেন। আলী তাঁকে বিবাহ করতে চান। মামূন রুদওয়ান একজন মেধাবী ছাত্র, খুব পরিশ্রমী ও অতি ভদ্র ছিলেন। তিনি ধৈর্য সহকারে আল্লাহ্, বেহেশ্ত ও ইসলামের প্রতি বিশ্বাস করতেন। তিনি সৎ ও নিষ্ঠাবান বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁর এক আত্মীয়াকে স্নাতক পরীক্ষা পাশ করার পর বিবাহ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। তৃতীয় বন্ধু মাহ্জূব আবদ-আল-দাইম ধর্ম বা কোন নীতিতেই বিশ্বাস করতেন না এবং তিনি নিজের স্বার্থ ব্যতীত কোন কিছুর প্রতি গুরুত্বও দিতেন না। তিন জনের মধ্যে তিনি খুব দরিদ্র ছিলেন। তাঁর পিতা আল-কানাতীর এলাকায় একটি ডেয়ারী কোম্পানীতে স্বল্প বেতনভূক একজন কেরানী ছিলেন। বিত্তহীন হওয়ায় মাহ্জূব বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ছিলেন না এবং তাঁর আবেগময় জীবন হতাশাব্যঞ্জক ছিল। ফলে তাঁর কোন বান্ধবী ছিলনা, এমনকি রাস্তায় পতিত সিগারেটের গোড়া খোঁজে তিনি ধূমপান করতেন। উপন্যাসটির প্লট কিছুদূর এগিয়ে গেলে মাহ্জূব দেশে যাওয়ার পত্র পেলেন। তাঁর পিতা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে কর্মশক্তি হারান। ফলে মাহ্জূব ছাত্রাবাস ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি দৈনিক এক বেলা খেয়ে জীবন যাপন করতেন। তিনি বই-পুস্তক ক্রয় করার জন্য বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের কাছে গর্ব সহকারে সাহায্য চাইতেন। তিনি তাঁর মায়ের পক্ষের

এক ধনী আত্মীয়ের কাছে সাহায্যের জন্য গেলে তাঁর সুন্দরী কন্যা তাহিয়্যার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাহিয়্যার ভালবাসা লাভের চেষ্টায় ব্যর্থ হন এবং তার পিতার সাহায্য পাওয়ার আশাও হারান। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তিনি পরে সলিম আল-ইখশীদী নামক একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীর নিকট আর্থিক সাহায্য কামনা করেন। সলিম প্রকৃত সাহায্য না করে তাঁকে তাঁর এক সাংবাদিক বন্ধুর অফিসে প্রবন্ধ অনুবাদের মাধ্যমে সামান্য কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য পাঠান। এইদিকে আলী ত্বাহা স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে একটি মানানসই চাকুরী নেন। মামুন ফ্রান্সে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি বৃত্তির মনোনয়ন পান। কিন্তু পারিবারিক সম্পর্কের কোন সমর্থন না থাকায় মাহ্‌জূব কোন চাকুরী পেলেন না। অনুবাদের অর্থ তাঁর ও তাঁর পিতা-মাতার খরচের জন্য যথেষ্ট ছিল না। সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে তিনি অগত্যা পুনরায় সালিম আল-ইখশীদীর সাহায্য কামনা করেন। সালিম তাঁর সুবিধার বাহন হিসাবে মাহ্‌জূবকে ব্যবহার করেন এবং এই শর্তে তাঁকে একটি ভাল চাকুরী দিতে চান যে মাহজূব একটি বিশেষ মেয়েকে বিবাহ করতে সম্মত হবেন। চাকুরীটি অতিসত্বর জেনারেল ম্যানেজার কাসিম বে-এর সেক্রেটারীর পদে উন্নীত করা হয়। এই পদে সালিম আল-ইখশীদ নিজেই অবস্থান করছেন। মেয়েটি বে-র একজন বান্ধবী ছিল। শর্তে আরো উল্লেখ করা হয় যে বে উক্ত মেয়ের সাথে বিবাহের পরও সম্পর্ক বজায় রাখবে। কিছু সময় ইতস্ততার পর মাহ্‌জূব তাঁর বন্ধুর প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং খুব তাড়াতাড়ী জানতে পারলেন যে মেয়েটি সুন্দরী ইহসান এবং আলী-ত্বাহার প্রথম বান্ধবী যিনি ত্বাহার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে ধনী ও বিবাহিত বে-র সান্নিধে আসেন। ইহসানের সাথে মাহজূবের বিবাহের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা করা হয় এবং নতুন দম্পতি বে-র ভাড়া করা একটি বাড়ীতে উঠেন। মাহজূব নতুন চাকুরীতে যোগদান করেন এবং বাসায় তাঁর স্ত্রীর সাথে জীবন-ধারণের কিছু প্রণালী নিয়ে অনুশীলনের চেষ্টা করেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করে। তাঁরা মদ্যপান করে লম্পট যুবকদের একটি দলে যোগ দেন। তাঁদের উত্তেজনা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়। কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁরা জানতে পারলেন যে সরকার

পদত্যাগ করতে যাচ্ছে এবং এতে কাসিম বে-র চাকুরীও শেষ হতে পারে। পরিণামে মাহজূবকে প্রাদেশিক কোন একটি সামান্য চাকুরীতে স্থানান্তর করা হবে। ঘটনাক্রমে সরকারের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলেও কাসিম বে হীন-পদস্থ না হয়ে নতুন সরকারের একজন মন্ত্রী হলেন। মাহজূব তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে পদোন্নতি লাভ করলেন এবং মন্ত্রীর দফতরের প্রধান সহকারী নিযুক্ত হলেন। কিন্তু তাঁর ক্রমবর্ধমান উন্নতি অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ শেষ হয়। এক শনিবারের বিকালে মাহজূবের বাইরে যাওয়ার সময় একটি অদ্ভুত ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। মাহজুবের পিতা কিছুটা সুস্থ হয়ে তাঁর বাসায় আসেন এবং মাহজূবকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। পিতা-মাতাকে না বলে বিবাহ করার জন্য তিনি তাকে তিরস্কার করেন। পিতা শান্ত হওয়ার পূর্বেই প্রতি সপ্তাহের রুটিন অনুসারে কাসিম বে-ও এখানে উপস্থিত হন। এর পর পরই কাসিম বে-র স্ত্রী এখানে আসেন। একটি বড় ধরনের কলঙ্কের জের হিসাবে কাসিম বে মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তিফা দেন। পরে মাহজূবকে দক্ষিণাঞ্চলে বদলি করে দেয়া হয়। উপন্যাসটিতে নাজীব মাহফূব সহজ কিন্তু বিশুদ্ধ ও উন্নত মানের আরবীসহ মধ্যম ভাষা (আল-লুগাত আল-উস্‌তা) ব্যবহার করেন, যার স্টাইল বা রচনাশৈলী ক্লাসিক্যাল আরবী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

৭. খান আল-খালীলী (খান আল-খালীলী কোয়ার্টার) : উপন্যাসটি 'আল-কাহিরা আল-জাদীদা'-এর এক বছর আগে ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয়। এটা একটি সামাজিক উপন্যাস। এর দশম সংস্করণ ১৯৭৯ সালে আত্মপ্রকাশ করে। উপন্যাসটিতে কায়রোর একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাগ্য বিপর্যয় নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে মিসরের উপর অক্ষশক্তির বিমান হামলার কারণে অনেক লোক খুব তাড়াতাড়ী সাফাকীনী কায়ার্টার ত্যাগ করেন। তাঁদের মধ্যে আহমদ আকিফ নামে প্রায় ৪০ বছরের নিম্ন বেতনভুক একজন সরকারী কেরানীও ছিলেন। তিনি তাঁর মা ও তাঁর অবসর-প্রাপ্ত কেরানী পিতা সহ আল-আযহার মসজিদের অনতিদূরে "খান আল-খালীলীর" বিখ্যাত পুরাতন কোয়ার্টারের একটি ফ্লাট বাড়ীতে স্থানান্তরিত হন। যৌবনের প্রারম্ভে

আহমদ একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন বিজ্ঞানী, লেখক ইত্যাদির মত একটি উজ্জ্বল জীবনের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু তাঁকে তাঁর এই আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাকে একজন জুনিয়ার কেরানীর জীবন বেছে নিতে হয়। কারণ তিনিই পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এবং ছোট ভাই রুশদীর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ শেষ করার জন্য একমাত্র আর্থিক সাহায্যকারী। নতুন কোয়ার্টারে কয়েকজন মধ্যবয়সী প্রতিবেশীর সাথে আহ্‌মদের বন্ধুত্ব হয় যাঁরা একটি কফি হাউজে বিকালের সময় কাটান। তিনি পুস্তকের চেয়েও এই সংঘকে অধিক আনন্দদায়ক মনে করতেন। তিনি রমযানের সময় খান এলাকার সুন্দর পরিবেশও উপভোগ করেন। এই নতুন কোয়ার্টারে নাওলা নামে ১৬ বছরের একটি স্কুলের বালিকা তাঁকে সব চেয়ে বেশী অভিভূত করে। তিনি গোপনে নাওলার কাছে প্রেম নিবেদন করেন। রোযার শেষে ঈদের আনন্দের দিন আহ্‌মদ সুখবর পেলেন যে তাঁর ছোট ভাই রুশদী আসয়ূত থেকে রাজধানী কায়রোতে স্থানান্তরিত হয়েছেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। বিশ বছর বয়স্ক রুশদী সুদর্শন ও উজ্জ্বল বর্ণের ছিলেন। তিনি পোষাকে পরিপাটি এবং মদ্যপান ও জুয়া খেলায় অসংযমী ছিলেন। তাঁর ভাই আহ্‌মদের সাথে নাওলার বেপরোয়া অনুরাগের কথা না জেনে তিনি তার কাছে প্রেম নিবেদন করে বসেন। প্রতিদিন স্কুলের পথে নাওলার সাথে রুশদীর দেখা হতো। কিছুদিন পর নাওলার পিতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার জন্য তিনি আহমদকে অনুরোধ জানান। হঠাৎ রুশদী ক্ষয় রোগের ন্যায় একটি বক্ষব্যাধিতে আক্রান্ত হন। নাওলার আনন্দ ও চাকুরী ছাড়ার ভয়ে রুশদী ডাক্তারের পরামর্শক্রমে স্বাস্থ্য নিবাসে যেতে চাইলেন না। কয়েক মাস পর রুশদীর শরীর আরো ভেঙ্গে যায় এবং জোর পূর্বক তাঁকে একটি স্বাস্থ্য-নিবাসে নিয়ে আসা হয়। অল্প কিছুদিন পর তিনি তাঁর ভাই আহ্‌মদের কাছে একটি হৃদয় বিদারক চিঠি লিখেন এবং তাঁকে মৃত্যুর পূর্বে দেশের বাড়ীতে নিয়ে যেতে লিখেন। এই দিকে নাওলা রুশদীকে বিবাহ করতে অনিচ্ছুক এবং রুশদীর ব্যাংকের চাকুরীটিও এক সময় চলে যায়। কিছুদিন পর রুশদীর মৃত্যু ঘটে। উপন্যাসটির শেষ কয়েকটি অধ্যায়ে শোকাহত পরিবারের দুর্দশার একটি করুণ চিত্র তুলে ধরা

হয়েছে। রুশদী ছিলেন পরিবারের একমাত্র আশা ভরসা। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারের লোকজন অতিসত্বর "খান আল-খালীলী" কোয়ার্টার ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৮. যুকাক আল-মিদাক্ক (মিদাক গলি) : পুরাতন কায়রো শহরের আল-আয্হার (আল-হোসাইন) কোয়ার্টারের একটি সড়কের নামানুসারে উপন্যাসটির নামকরণ করা হয়। প্রকৃত অর্থে উপন্যাসটি পুরাতন কায়রোর আল-হোসাইন কোয়ার্টারের একটি গলির কাহিনীও বটে। উপন্যাসটিতে গ্রহণযোগ্য কোন কেন্দ্রীয় প্লট নেই। উপন্যাসটির ঘটনাকাল ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও এই অবহেলিত ও বিনয়ী পুরাতন গলির জীবন যাত্রার মান পরিবর্তন করতে পারে নি। উপন্যাসটিতে মিদাক্ক গলির একদল বাসিন্দার কয়েক মাসের জীবন যাপন প্রণালীর একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তাঁদের মিশ্রিত ভাগ্য পরস্পরকে প্রভাবিত করে। উপন্যাসটিতে দুইটি প্রধান চরিত্র রয়েছে। অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো হামীদা। হামীদা স্থানীয় নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন সুন্দরী, অশিক্ষিতা, উদ্ধত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্না সরল মহিলা—যিনি এক পর্যয়ে পতিতায় পরিণত হতে বাধ্য হন। উপন্যাসের অন্য প্রধান চরিত্রটি হলো আব্বাস আল-হলো। আব্বাস গলির একজন দরিদ্র ও শান্ত স্বভাবের কেশবিন্যাসক ছিলেন। তিনি সুদর্শনা হামীদার প্রেমে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। হামীদা ভালভাবে বুঝতে পারেন যে প্রতিবেশী লোকদের মধ্যে আব্বাসই একমাত্র তার ভবিষ্যতের স্বামী হওয়ার উপযুক্ত। তবে তিনি ভবিষ্যতের দরিদ্রতা, ফাঁদে পড়া ও নোংরা সন্তান জন্মের কথা মনে করে বিরক্তিবোধ করেন। এই দিকে আব্বাস কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য কয়েক বছর বাইরে যাওয়ার সংকল্প করেন। তাঁর এক বন্ধু তাঁকে একটি ব্রিটিশ সেনা ক্যাম্পে কাজ করার জন্য রাজী করান। তিনি বিদায়ের প্রাক্কালে উপার্জিত অর্থ হামীদাকে পাঠাবেন বলে স্থির করেন, যদিও এতে হামীদার তেমন উৎসাহ পাওয়া যায়নি। আব্বাস চলে যাওয়ার পরপরই সালীম ইলওয়ান নামক একজন ধনী ব্যবসায়ী হামীদার নতুন পাণি প্রার্থী হলেন। পঞ্চাশ বছর বয়স্ক বিবাহিত সালীম অনেক বিবাহিত সন্তানের পিতাও

বটে। হামীদা এবং তার ধাইমা মরু-ক্যাম্পের বাগদত্তকে প্রত্যাখ্যান করে সালীমের সাথে হামীদার বিবাহ প্রস্তাবে রাজী হন। তবে এই ধনী পরিবারে হামীদার বিবাহ হলোনা, কারণ ইতিমধ্যে সালীম দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর স্বাস্থ্যহানী ঘটে এবং তিনি পৃথিবীর আনন্দ উপভোগ করতে ব্যর্থ হন। পরে হামীদা ফরাজ-ইব্রাহীম নামক একজন বহিরাগত সুদর্শন যুবকের সান্নিধ্যে আসেন। যুবকটি বিদেশী সৈনিকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে আনন্দদায়ী বালিকাদের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। ইতিমধ্যেই হামীদা এই ধরনের প্রশিক্ষণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হন। এই দিকে আব্বাস কয়েক মাস পর গলিতে ফিরে এসে দেখলেন যে তাঁর প্রেমিকা হামীদা নিরুদ্দেশ। আব্বাস তাঁর প্রেমিকার অপহরণকারীর প্রতি প্রতিশোধ নিতে প্রতি প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন। কিন্তু ফরাজ ইব্রাহীমের সাথে হামীদার সম্পর্ক এই সময় ভাল যাচ্ছিল না, তাই তিনি আব্বাসের সাহায্য কামনা করেন। হামীদা প্রতারণাকারীর সন্ধান দেয়ার জন্য আব্বাসকে নির্দিষ্ট দিনে একটি কফি হাউজে আসতে বলেন। কিন্তু নির্ধারিত দিনের আগেই আব্বাস উক্ত দোকানে এসে দেখলেন যে হামীদা একদল ব্রিটিশ মদ্যপায়ী সৈন্যকে আপ্যায়ন করছেন। ক্রোধের বশীভূত হয়ে আব্বাস একটি খালি বোতলের দ্বারা হামীদাকে আঘাত করেন। হামীদা গুরুতর রূপে আহত হন। হতাশ সেনাদল পরিণামে আব্বাসকে প্রহার করতে করতে মেরে ফেলে। উপন্যাসটি ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮২ সালে এর দশম সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করে।

৯. আল-সারাব (মরীচিকা): নাজীবের পরবর্তী উপন্যাস হলো আল-সারাব বা মরীচিকা। এটা ১৯৫২ সালের পূর্বকার ব্যতিক্রমধর্মী একটি প্রকৃত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। উপন্যাসটিতে চিকিৎসা বিষয়ের উপর একটি পরিপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা রয়েছে। মিসরের আধুনিক সাহিত্যে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসাবে এটা প্রায়ই বিবেচিত। নায়ক কামিল রুবা লাজের স্মৃতিচারণ রূপে উপন্যাসটির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কামিল তুর্কী বংশোদ্ভূত কায়রোর একটি ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা মাদক আসক্ত একজন বেকার ব্যক্তি ছিলেন। কামিলের শৈশবে তাঁর পিতা তাঁর মাকে ত্যাগ করে ঘর

ছাড়েন এবং মাদক দ্রব্য সেবন করে জীবন কাটান। কামিল মার সাথে তাঁর দাদার বাড়ীতেই লালিত পালিত হতে থাকেন। তাঁর দাদা অবসরপ্রাপ্ত একজন সামরিক অফিসার ছিলেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কামিল কৃতকার্য হতে ব্যর্থ হন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি মাধ্যমিক স্কুলের পড়ালেখা শেষ করেন। দাদা তাঁকে একটি মিলিটারী একাডেমীতে ভর্তি করানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। ব্যর্থ হয়ে কামিল একটি আইন কলেজে ভর্তি হন এবং দুই মাস পরই জন-সভায় বক্তৃতার ক্লাসে ভাষণ দেয়ার ভয়ে কলেজ ত্যাগ করেন। পরে একটি সরকারী অফিসে একজন নিম্নমানের কেরানীর চাকরী তিনি বেছে নেন। এই সময় প্রতিবেশী সুন্দরী রাবাবের প্রেমে তিনি আবদ্ধ হন। রাবাব শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের একজন ছাত্রী ছিলেন। ইতি-মধ্যে দাদার মৃত্যু ঘটলে স্বল্প বেতনভোগী কামিল একাই একটা পরিবার গড়তে চাইলেন। এক সময় তিনি আর্থিক সাহায্য চাইলে তাঁর পিতা তাঁকে নিষ্ঠুর ভাবে বিমুখ করেন। কিছুদিন পর পিতার মৃত্যু হলে কামিল উত্তরাধিকার সূত্রে একটি মোটা অংকের টাকার মালিক হন। এই সময় কামিল অধিক সাহসিকতার সাথে রাবাবকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। কামিলের মায়ের অমতেই তাঁর সাথে রাবাবের বিবাহ সম্পন্ন হয়। রাবাব স্কুলে একটি শিক্ষকতার চাকরী নেন। কামিল, রাবাব ও রাবাবের মা একটি নতুন ফ্ল্যাটে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু কামিলের সুখ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি বুঝতে পারলেন যে বৈবাহিক জীবন উপভোগ করতে তিনি অপারগ। কামিল বেশ কয়েক মাস কৌমার্য জীবন কাটালেও রাবাব কোন অভিযোগ করেন নি। তিনি তাঁর প্রিয় স্বামীর প্রতি অধিক ভাল-বাসা দেখাতেন। তাঁরা উভয়ে প্রাক্-বিবাহ অভ্যাসে ফিরে যাওয়ারও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন। শিক্ষকতার পর অবসর সময়ে স্ত্রীকে তাঁর আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে বেড়ানোর অনুমতি দিয়ে কামিল নিজে ঘরের বাইরে রাত যাপন করতে থাকেন। একদিন স্ত্রীকে একটি অদ্ভুত ধরনের পত্র পড়তে দেখে কামিলের সন্দেহ জাগে। তিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ চেষ্টা করেও এর কারণ অনুসন্ধান করতে পারেননি। ইতি মধ্যে ইনায়াত নামক চল্লিশ বছরের এক বিধবার সাথে কামিলের সাক্ষাৎ ঘটে। কামিল বিধবার প্রতারণার খপ্পরে পড়েন এবং সারা

বিকাল তার সাথে কাটান। কয়েক সপ্তাহ পর কামিল ঘরে ফিরে আসেন। তিনি খবর পেলেন যে তাঁর স্ত্রী তাঁর পিতা মাতার আশ্রয়ে থেকে কঠিন ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়েছেন। সত্বর স্ত্রীকে দেখার জন্য তিনি যান এবং একজন ডাক্তার ডাকার অনুমতি চাইলে তাঁর শাশুড়ী নিষেধ করেন। পরের দিন সকালে অফিসে যাওয়ার আগে তিনি স্ত্রীকে দেখতে যান। তখন স্ত্রীকে খুব ম্লান দেখাচ্ছিল। অফিসের কাজে তাঁর মন বসেনি, তাই তিনি দুপুরে আবার দেখতে যান তাঁর স্ত্রীকে। এই সময় তিনি স্ত্রীকে মৃত দেখতে পান। তাঁর শাশুড়ী বলেন যে রাবাবের এক আত্মীয় যুবক-ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল এবং তাঁর পরামর্শক্রমে রাবাবের অপারেশন হয়। ফলে রাবাব মারা যায়। অর্ধ পাগল অবস্থায় কামিল সংগে সংগে পুলিশ ডেকে তদন্ত করান এবং রিপোর্টে ধরা পড়ে যে রাবাবকে গর্ভপাতের অপারেশন করা হয়। জোর তদন্তের ফলে জানা যায় যে রাবাবের সর্বনাশা গর্ভপাত ও গর্ভের জন্য উক্ত আত্মীয় ডাক্তারই দায়ী ছিল। কামিল তাঁর অসুস্থ মাকে বাড়ী এসে এই দুর্ঘটনার কথা বর্ণনা করলে তাঁর মা রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। খুব ভোরে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ায় কামিল তা জানতে পারেন নি। দুপুরে এসে তিনি মার মৃত্যুর খবর পেলেন। তিনি নিজকে তাঁর মা ও স্ত্রীর হত্যার জন্য দায়ী মনে করলেন। তিন দিন তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থেকে জাগ্রত হলেন। তিনি নিরুপায় হয়ে বিধবা ইনায়েতের কাছে চলে যান। উপন্যাসটি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং এর দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৪৮ সালে বের হয়। উপন্যাসটির বর্ণনার সাথে আল-মাযিনীর 'ইব্রাহীম আল-কাতিব' ও আল-আক্কাদের 'সারা' উপন্যাসের বর্ণনার মিল পাওয়া যায়।

১০. বিদায়া ওয়া নিহায়া (সূচনা ও সমাপ্তি) : মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার পর এই উপন্যাসটি পুরাতন বিষয়বস্তুর দিকে ফিরে যাওয়ার উপাদানকে বহুলাংশে উপস্থাপন করেছে। ১৯৩০ সালের মাঝা-মাঝি সময়ে একটি স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত মিসরীয় পরিবারের প্রধান ব্যক্তি পিতার মৃত্যুজনিত কারণে পরিবারটির ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মত একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি রচনা করা হয়। পিতা সরকারী অফিসের একজন নিম্নমান কেরানী ছিলেন। তাঁর হঠাৎ মৃত্যুতে পরিবারটি চরম দুর-

বস্থার সম্মুখীন হয়। উপন্যাসের অন্য চরিত্র মা একজন স্বেচ্ছাচারিণী ও বিত্তশালী মহিলা ছিলেন। তিনি পরিবারটিকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও তাঁর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য- বসিত হয়। উপন্যাসটির সূচনায় পঁচিশ বছর বয়স্ক বড় ছেলে হাসান একজন ক্ষতিকারক অলস ব্যক্তি ছিলেন এবং গান বাজনা করে জীবন কাটাবার উচ্চা-ভিলাষী ছিলেন। তিনি অধঃপতিত ও নৈতিক বিচ্যু-তির জীবন যাপন করতেন। বাড়ী ছেড়ে তিনি নিষিদ্ধ এলাকায় বসবাস করতেন এবং পেশা হিসেবে তিনি মাদকদ্রব্য চোরাচালানীর ব্যবসায় বেছে নেন। তবে প্রয়োজনের সময় তিনি অন্যান্য ভাইকে আথিক সাহায্য করা অব্যাহত রাখেন। পরিবারের প্রায় তেইশ বছর বয়স্কা কন্যা নাফীসা বিবাহ করার সব আশা আকাঙক্ষা হারিয়ে ফেলেন। নাফীসা দেখতে কুৎসিত ছিলেন এবং বর্তমানে পরিবারকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে পোশাক তৈরীর পেশা বেছে নেন। তাঁর নতুন পেশা মিসরীয় রীতি-নীতিতে সামাজিক মর্যাদার পক্ষে হানিকর ছিল। তিনি একই এলাকার সালমান নামক একজন মুদি দোকানদারের বিবাহ প্রস্তাবে রাজী হয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু সালমান তাঁর সাথে প্রতারণা করে অন্য একজন বিত্তশালী মেয়েকে বিবাহ করে। নাফীসা হতাশা ও দারিদ্র্যের কারণে পতিতাবৃত্তির খপ্পরে পতিত হন। তাঁর ছোট ভাই উনিশ বছরের হোসাইন ও সতের বছরের হাসনাইন তাঁদের মাধ্যমিক স্কুলের পড়ালেখার শেষ পর্যায়ে ছিলেন। হোসাইন অতীব ভদ্র, ঐকান্তিক এবং ধার্মিক ছিলেন। তিনি পড়ালেখা এখানেই বন্ধ করে উচ্চ শিক্ষার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এবং আথিক সাহায্যের মাধ্যমে ছোট ভাই হাসনাইনের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করার জন্য পরিবার থেকে অনেক দূরে তান্তা গিয়ে একটি নিম্ন বেতনের কেরানীর চাকরী নেন। হোসাইন তান্তায় তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার এক কন্যার সাথে সাক্ষাৎ করেন। মেয়েটি তাঁর উপযুক্ত বলে কিছু সময়ের জন্য তিনি তার সাথে জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখেন। তবে তিনি পরক্ষণেই তাঁর স্বপ্ন পরিত্যাগ করেন যখন তাঁর মা ইঙ্গিত দিলেন যে তাঁর বিবাহ পরিবারের অবশিষ্ট লোকজনের জীবিকা বিপন্ন করবে। অন্যদিকে ছোট ভাই হাসনাইন অধিক উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি বড় ভাই হাসান, মেঝ ভাই হোসাইন ও বোন নাফীসার আত্মত্যাগ

এবং তাঁদের কষ্টে উপার্জিত অর্থ লেখাপড়ার কাজে খরচ করতে থাকেন। হাসনাইন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষা সমাপন করার পর মিলিটারী একাডেমিতে ভর্তি হন। একজন পেশাদার সামরিক অফিসার হিসাবে কিছুদিনের মধ্যে তিনি কমিশন র‍্যাংক পান। এবং সমাজে উচ্চ মর্যাদাসীন হওয়ার স্বপ্ন ও পরিকল্পনা করতে থাকেন। একটি ধনী পরিবারের মেয়েকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর প্রতিবেশিনী বাগদত্তা বাহিয়্যা বিন্‌ত আল-জীযানকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তাঁর অতীতকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করেন এবং একজন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কর্মকর্তার মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব রাখেন। কিছুদিনের মধ্যে স্রোতের গতি তাঁর অনুকূলে এসেছে বলে মনে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই পর্যায়ক্রমে তাঁর পরাজয় ঘটে। তিনি আবিষ্কার ক'রে আতঙ্কিত হলেন যে উঁচু সমাজ বা অভিজাত সমাজ একজন দরজি ও চোরাকারবারীর ভাইকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। সন্দেহজনক জীবন-পদ্ধতি ত্যাগ করার জন্য তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ হাসান প্রত্যাখ্যান করেন। পরিশেষে পুলিশ হাসানের অনুসন্ধানে তাদের ফ্ল্যাটে আসে। ক্রোধ এবং লজ্জিত হয়ে হাসনাইন পরিবারের লোকজনদেরকে নিয়ে ভিন্ন একটি অধিক আভিজাত্য এলাকায় বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। নতুন বাড়ীতে আসার পরও হাসান পুলিশের গুলিতে মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে পলায়ন করেন। সবশেষে হাসনাইনকে পুলিশ-স্টেশনে ডেকে জানানো হয় যে তাঁর বোন নাফীসাকে তাঁর এক প্রেমিকের সাথে পতিতালয়ে পাওয়া গিয়েছে। হাসনাইন বোনকে জোরপূর্বক নীল নদে ডুবে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেন এবং নিজেও আত্মহত্যা করেন। উপন্যাসটির নায়ক হাসনাইনের চরিত্র নাজীব নিখুঁত ভাবে অংকন করেছেন। একটি উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে উন্নীত হওয়ার পথে একটি চরম সত্য প্রকাশের পর হাসনাইনের জীবনাবসান ঘটে। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটিতে তদানিন্তন মিসরীয় সমাজের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৪৮ সালের পূর্বে হলেও ১৯৪৯ সালে 'আল-সারাব'-এর পর এটা প্রকাশিত হয়। কোন কোন গ্রন্থ তালিকায় উপন্যাসটি ১৯৫০ অথবা ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়। উপন্যাসটির চতুর্দশ সংস্করণ ১৯৮৪ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

আল-সুলাসিয়্যাত (ত্রয়ী উপন্যাস) : নাজীবের প্রখ্যাত আল-সুলাসিয়্যাত বা ত্রয়ী উপন্যাস মূলতঃ তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—বায়ন আল-কাস্‌রাইন (একটি এলাকার নাম), কাসর আল-শাওক (একটি এলাকার নাম) এবং আল-সুক্কারিয়্যা (একটি এলাকার নাম)। নিম্নে প্রত্যেক খণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো :

১১. বায়ন আল-কাসরাইন : ত্রয়ী উপন্যাসের এই খণ্ডে ১৯১৯ সালের বিপ্লব ও তার আগের একটি মধ্যবিত্ত মিসরীয় পরিবারের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উপন্যাসটির প্লট আঠারো মাসের সময়সীমায় পরিব্যাপ্ত। সময়টি হলো ১০ই নভেম্বর ১৯১৭ সাল থেকে ৮ই এপ্রিল ১৯১৯ সাল পর্যন্ত। উপন্যাসটির এই খণ্ডের লেখা ১৯৫২ সালে শেষ হয়, এবং ১৯৫৬ সালে প্রকাশ পায়। এর দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৮৩ সালে আত্মপ্রকাশ করে। সমসাময়িক মিসরের ঘটনা-বলী আলোচনা না করে ত্রয়ী উপন্যাসের সব কয়টি অংশে শুধু ১৯১৯ সালের কিছু সময় পূর্ব থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রারম্ভিক কালের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মিসরীয় বাস্তববাদের ক্ষেত্রে উপন্যাসের এই অংশের সাথে তাওফীক আল-হাকীম রচিত 'আওদাত আল-রুহ' (আত্মার প্রত্যাবর্তন) এর তুলনা করা যায়। তবে উচ্চতা ও আকারের দিক থেকে ১ম টি ২য় টি অপেক্ষা অনেক বড়। ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাস 'শাজারাত আল-বূস' (দুঃখের গাছ)-এর ন্যায় আধুনিক আরবী সাহিত্যে নাজীবের ত্রয়ী উপন্যাসেও একটি পরিবারের তিনটি প্রজন্মের বাস্তব কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের কাহিনী প্রথম মহাযুদ্ধের আগের ঘটনা থেকে শুরু হয়। দ্বিতীয়টির সূচনা প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত পর থেকে। তৃতীয় খণ্ডটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে শুরু হয়। পরিবারের পিতার ঐতিহ্য ও সামাজিক নিশ্চয়তা ১৯১৯ সালের বিপ্লব বিপন্ন করে দেয়। দ্বিতীয় প্রজন্মকে তৃতীয় প্রজন্মের দ্বিধাপূর্ণ সংক্রমণ হিসাবে চিত্রায়িত করা হয়। তৃতীয় প্রজন্মকে বিতর্কিত সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও মুসলিম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই ধরনের পৃথকীকরণ নাজীবের একই সময়ের উপন্যাস' আল-কাহিরা আল-জাদীদা' (আধুনিক কায়রো)-তেও দেখা যায়। ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে প্রায় পঁয়তাল্লিশ

বছর বয়সের একজন ব্যবসায়ী আল-সায়্যিদ আহমদ আব্‌দ আল-জাওয়াদকে আল-হোসাইন মসজিদের অনতিদূরে বায়ন আল-কাসরাইন এলাকায় অবস্থিত নিজ বাড়ীতে তাঁর পরিবারটিকে অতি কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সাথে পরিচালনা করতে দেখা যায়। আল-সায়্যিদ সম্পর্কে পরিবারের লোকজন খুব কমই জানতেন। কেননা তাঁর সন্তানেরা তাঁকে কখনো হাসতে দেখেনি। তিনি ভোর রাত পর্যন্ত মধ্যম বয়সী একদল ব্যবসায়ীর মাঝে আনন্দমুখর সময় কাটাতেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের উপর কঠোর নৈতিক অনুশাসন আরোপ করেন অথচ তিনি নিজেই নারী-সাহচর্যে ও মদ্যপানে সময় অতিবাহিত করতেন। উপন্যাসটির ঘটনা প্রবাহের শুরুতেই আমরা আল-সায়্যিদকে যোবায়দা নামী একজন সুপরিচিতা গায়িকার সাথে কর্মব্যস্ত দেখতে পাই। যোবায়দা দৈহিক দিক থেকে আদর্শ সুন্দরী যুবতী ছিলেন। তার মন জয় করাতে আল-সায়্যিদের বন্ধুগণ ঈর্ষান্বিত হয়েও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে। আল-সায়্যিদের একজন প্রতিবেশী মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী বাহীজা তাঁর করুণাপ্রার্থী হয়। তিনি বিধবাকে যথাযথ সাহায্য করতে ত্রুটি করলেন না। তিনি তার তিনটি ছেলে ইয়াসীন, ফাহমী ও কামালের সাথে চাকরের মতো ব্যবহার করতেন। তাঁর দুই কন্যা খাদিজা ও আয়েশার প্রতি এমন অনুশাসন জারি করা হয়েছিল যে তারা জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি মারারও অনুমতি পাননি। উপন্যাসটির চলমান গতিতে একরাতে তিনি বাহীজার ঘর ত্যাগ করার সময় ব্রিটিশ সৈন্য কর্তৃক অন্যান্যদের সাথে ধৃত হন এবং নির্দয়ভাবে তাঁদেরকে একটি গর্তে ফেলে দেয়া হয়। পরের দিন সকালে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। আল-সায়্যিদ তাঁর প্রথম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন এবং একজন শেখের কন্যা আমীনাকে বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রী তাঁর কঠোর নিয়ম মানতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু আমীনা তা মেনে নেন। আমীনাকে ঘরের বাইরে যেতে দেয়া হতোনা এবং বিগত বিশ বছরে শুধু কয়েকবার স্বামীর সাথে গিয়ে তাঁর বৃদ্ধা মাকে দেখার জন্য বের হতে দেয়া হয়। একদিন আল-সায়্যিদ ব্যবসায়ের কাজে পোর্ট সাইদে যান। আমীনা তার সন্তান-দের অনুরোধে তাঁর ছেলে কামালের সাথে আল-হোসাইন মসজিদ দেখতে যান। বাড়ী ফেরার পথে তিনি একটি গাড়ীর ধাক্কায় আঘাত

প্রাপ্ত হন। সুস্থ হওয়ার পর আল-সায়্যিদ তাঁকে অনতিবিলম্বে তাঁর ঘর ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দেন। আমীনা নিরবে এ-আদেশ মেনে নেন এবং তাঁর মায়ের বাড়ী চলে যান। তাঁর ছেলে-মেয়েরা তাঁকে বারণ করার সাহস পেল না। পরে পরিবারের একজন বান্ধবী বৃদ্ধা-মহিলার সুপারিশে আল-সায়্যিদ তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। বৃদ্ধা মহিলা আল-সায়্যিদের ছোট মেয়ে আয়েশার সাথে তার ছেলের বিবাহের প্রস্তাব দেন। আল-সায়্যিদের বিশ বছর বয়স্ক বড় ছেলে ইয়াসীন স্কুলের একজন নিম্নমানের কেরানীর চাকুরী করতেন। তার জন্মের আগে তার পিতা তার মাকে পরিত্যাগ করেন। তিনি নয় বছর তার মার সাথে থাকার পর পিতার কাছে চলে আসেন। তার মা সর্বশেষে এক যুবককে আবার বিবাহ করেন। মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার পথে তার জন্য এটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি অল্প শিক্ষিত ছিলেন এবং পিতার চেয়ে কম লম্পট ছিলেন না। পিতা তাকে তাঁর এক বন্ধুর মেয়ে যয়নাবের সাথে বিবাহ দেন। নতুন দম্পতি আল-সায়্যিদের ঘরেই বসবাস করতে থাকে। একটি অবাঞ্ছিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইয়াসীন তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন। উপন্যাসটির শেষ দিকে দেখা যায় যে, ইয়াসীনের মা ইয়াসিনকে কাসর আল-শাওক এলাকার বাড়ীতে রেখে অবশেষে মারা যায়। এ দিকে আমীনার বড় ছেলে ফাহমী ছিলেন আইনের ছাত্র। তিনি অধ্যবসায়ী, শান্ত এবং চিন্তাশীল ছিলেন। তিনি মরিয়ম নামে এক প্রতিবেশিনীর প্রেমে আবদ্ধ হন। তিনি মার মাধ্যমে নিজের পিতার কাছে এই বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ করেন। আল-সায়্যিদ শুনে ভীষণ ক্ষিপ্ত হন। কারণ তাঁর ছেলে মেয়েদের প্রেম করা একেবারেই নিষেধ ছিল। ফাহমী ১৯১৯ সালের আন্দোলনে ওয়াফ্‌দ পার্টিতে সরাসরি যোগ দেন। তিনি ছাত্র সংঘের একজন নির্বাচিত সদস্য হন এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। পরে তিনি একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে সেনাবাহিনী কর্তৃক নিহত হন। আল-সায়্যিদের প্রায় দশ বছর বয়স্ক ছোট ছেলে কামাল ত্রয়ী উপন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের নায়ক ছিলেন। প্রথম খণ্ডে তিনি ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন না। তিনি খেলাধূলা এবং গল্প ও সঙ্গীতে অধিক আগ্রহী ছিলেন। পরিবারের অসন্তোষ সত্ত্বেও তিনি বাড়ীর পার্শ্ববর্তী ক্যাম্পে ব্রিটিশ সেনাদের সাথ বন্ধুত্ব

গড়ে তুলেন। আল-সায়্যিদের বিশ বছরের কন্যা খাদীজা এবং ষোল বছরের আয়েশা বাহ্যিক রূপ ও স্বভাবে পরস্পর ভিন্ন ছিলেন। বড় বোন কুৎসিত, পরিশ্রমী, বাস্তবধর্মী এবং কিছুটা বিদ্বেষ পরায়ণা ছিলেন। ছোট বোন আয়েশা একজন ভাসা ভাসা সুন্দরী। তিনি সৎ-স্বভাব হলেও আলসে ছিলেন। তবে উভয় বোনই অর্ধ শিক্ষিতা এবং ঘরের চার দেয়ালে বন্দিনী ছিলেন। খাদিজার দীর্ঘ দিন ধরে বিবাহ হয় না। তাঁর পিতাও কন্যাকে নিচু পরিবারে বিবাহ দিতে রাজী নন। তিনি ছোট কন্যা আয়েশাকে বড় কন্যার আগে বিবাহ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। তবুও তিনি তাঁর এক পুরাতন ধনী, দাম্ভিক তুর্কী-বন্ধুর বিধবা স্ত্রী মিসেস শাওকতের অনুরোধে রাজী হন এবং বিধবার ছোট ছেলে খলীলের সাথে তাঁর কন্যা আয়েশাকে চুপ চাপ বিবাহ দেন। আল-সুক্কারিয়্যা এলাকায় অবস্থিত শাওকতের বাড়ীতে নতুন দম্পতি বসবাস করতে থাকে এবং একসময় তারা কন্যা নাইমার জন্ম দেন। নবজাতিকা শিশু কন্যার হৃদযন্ত্র দুর্বল ছিল। ডাক্তারের মতে সে বিশ বছরের বেশী বাঁচবে না। এই একই বিধবা মিসেস শাওকত তাঁর চল্লিশ বছরের বিপত্নীক ছেলে ইব্রাহীমের সাথে আল-সায়্যিদের বড় কন্যা খাদীজার বিবাহ দেন। খাদীজা খুবই আনন্দিত হন। ত্রয়ী-উপন্যাসের এই প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি ঘটে সর্বজনীন বিজয় উৎসবের দিনে আল-সায়্যিদ পরিবারে একটি ভয়ানক বিপর্যয় সূচিত হওয়ার মাধ্যমে। অনেক রক্তের বিনিময়ে জনগণের সংগ্রাম জয়ী হয় এবং দীর্ঘ দিন ব্রিটিশ কারাগারে আবদ্ধ জনৈক জাতীয় নেতাকে ছেড়ে দেয়া হয়। সর্বত্র মহোল্লাস বিরাজ করছিল। একই দিনে ফাহমী তার পিতাকে নিজের অবাধ্যতার জন্য ক্ষমা করতে অনুরোধ করেন এবং নিজেই কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে জাতীয় নেতার সম্মানে একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলের আয়োজন করেন। আনন্দমুখর মিছিলকারীদের উপর হঠাৎ এলোপাতাড়ী গুলি করা হয় ফলে ফাহমী রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেন। তিন জন ছাত্র আল-সায়্যিদের মুদি দোকানে এসে খবর দেয় যে তার ছেলে একজন জাতীয় শহীদ।

১২. কাসর আল-শাওক (কাসর আল-শাওক এলাকা) : এই খণ্ডের ঘটনা প্রবাহের সময়কার হলো সেপ্টেম্বর ১৯২৪ সাল থেকে আগস্ট ১৯২৭ সাল পর্যন্ত। আল-সায়্যিদের মেঝ ছেলে ফাহমীর মৃত্যুর পর পাঁচ

বছর অতিবাহিত হলেও পরিবারে নিরানন্দ ও বিষাদের ছায়া তখনো বিরাজ করছিলো। ফাহমীর মা আমীনা পুত্রশোকে চল্লিশ বছর বয়সেই একজন অনমনীয় বৃদ্ধা মহিলায় রূপান্তরিত হন। আল সায়্যিদ বাড়ীতে বিশেষ করে তার স্ত্রীর নিকট একজন অর্ধমাতাল কঠোর ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন। তিনি নারী সাহচর্য ও মদ্য পান থেকে দূরে থাকেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে আবার মদ্য পান শুরু করেন। নারীর প্রতি তাঁর দুর্বলতা পুনরুজ্জীবিত হয় এবং পরিণামে তিনি অজ্ঞাত ভাবে অতিসত্বর বড় ছেলে ইয়ামীনের প্রাক্তন প্রণয়িনী যান্নুবার প্রেমে পড়েন। বিনিময়ে যান্নুবা অধিক অর্থ দাবী করে এবং তাকে বিবাহ করারও প্রস্তাব দেয়। তবে মর্যাদা ও সম্ভ্রমের ভয়ে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং এক পর্যায়ে যান্নুবার আসল পরিচয় জানতে পেরে ভেঙ্গে পড়েন। এই দিকে তাঁর ছোট ছেলে সতের বছরের কামাল স্কুলের পড়া-লেখা শেষ করে পিতাকে বিস্মিত করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ভর্তি হন। কামাল একজন লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন এবং কয়েকটি সংবাদ-পত্রে প্রবন্ধ ছাপাতে থাকেন। আল-সায়্যিদ যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর ছেলে কামাল ডারউইনের বিবর্তনবাদের উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন তখন একটি কৌতুকপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তিনি কামালকে ডেকে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের বিপরীত এই নিন্দনীয় ধারণায় তিনি কিভাবে অনুপ্রাণিত হলেন তা' জিজ্ঞাসা করেন। কামাল কৌশলে পিতার ক্রোধ এড়িয়ে যান এবং দাবী করেন যে তিনি নিজে মতবাদটি অনুসরণ করেন না। মূলতঃ কামাল ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি সংকটে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁর মধ্যে মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাদা সিধে বিশ্বাসের স্থান দখল করে কতিপয় ভ্রান্ত ধারণা। তবে এখন আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় লাভ করার পর তিনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারাতে থাকেন। এই সময় আয়িদা শাদদাদ নামী সম্ভ্রান্ত এক মেয়ের প্রেমের প্রচণ্ড আবেগ তাঁর অন্তরকে আরো যন্ত্রণা দেয়। আয়িদা তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। স্কুলে পড়া-লেখার সময় তিনি আয়িদার রূপ ও পাশ্চাত্য আচরণে অধিক মুগ্ধ হন। কিন্তু তাঁর প্রেম প্রত্যাখ্যান করে আয়িদা এক সময় এক ধনী যুবককে বিবাহ করেন। কামাল নিরাশ হয়ে সংযমের মাধ্যমে মদ্যপান করতে থাকেন এবং নিষিদ্ধ এলাকাতেও যেতে থাকেন। একসময় তিনি তাঁর বড় ভাই ইয়াসীনকে সেখানে

দেখতে পান। তিনি নীতিভ্রষ্টতার শিকার হয়েছেন বলে তার মনে হয়। এই দিকে ইয়াসীন পরিবারের মান মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতেই থাকেন। তিনি ফাহমীর পরিত্যক্তা স্ত্রী মরিয়মকে বিবাহ করেন। এতে আমীনা দুঃখিত হলে ইয়াসীন স্ত্রীসহ পিতার বাড়ী ত্যাগ করেন এবং কাস্‌র আল- শাওক এলাকায় নিজের বাড়ীতে বসবাস করতে থাকেন। কিছু দিন পর তিনি মরিয়মের আকর্ষণ ত্যাগ করে তাঁর পিতার প্রণয়িনী ও নিজের পুরাতন বান্ধবী গায়িকা যান্নুবাকে ঘরে তুলে নেন। মরিয়ম বিরক্ত হয়ে একরাত্রে ঘর থেকে বের হয়ে যান এবং ইয়াসীন ক্রোধ-বশতঃ তাঁকে পরিত্যাগ করেন। যান্নুবা তখন সম্পূর্ণরূপে ইয়াসীনের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন এবং একপর্যায়ে তাদের গোপনে বিবাহ হয়। ইয়াসীনের সর্বশেষ এই ভুলের খবর শুনে আল-সায়্যিদ তাঁকে তিরস্কার করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি। ইয়াসীনের প্রথম স্ত্রীর ছেলে রুদওয়ান জন্মগ্রহণ করলে তাকে তার নানা বাড়ীতে থাকতে দেন। অন্যদিকে খাদীজা ও আয়েশা একই ঘরে একই শাশুড়ীর কাছে থাকলেও তাঁদের সম্পর্ক ভিন্ন ধরনের ছিল। ছিমছাম এবং দাম্ভিক খাদীজা কখনো বৃদ্ধা শাশুড়ীর সাথে শান্তিতে ছিলেন না। ফলে একপর্যায়ে আল-সায়্যিদকে তাঁর উদ্ধত মেয়ের শাসনের জন্য ডাকা হয়। আব্‌দ আল-মুনিম ও আহমদ নামে খাদীজার দুই পুত্র সন্তান ছিল। বৌমা হিসাবে আয়েশা শাশুড়ীর নিকট খুব বিনয়ী ছিলেন। আয়েশার দুই ছেলে ও এক কন্যা ছিল। আয়েশার শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীনচেতা জীবনে একসময় সর্বনাশ নেমে আসে। তাঁর স্বামী ও দুই ছেলে হঠাৎ টাইফয়েড রোগে মারা যায়। আয়েশা তাঁর কন্যাকে নিয়ে মা বাবার কাছে চলে আসেন। উপন্যাসটি ১৯৫৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৪ সালে এর দ্বাদশ সংস্করণ বের হয়।

১৩. আল-মুক্কারিয়্যাহ (আল-মুক্কারিয়্যা এলাকা) : ত্রয়ী উপন্যাসের এই তৃতীয় ও শেষ খণ্ডের ঘটনা প্রবাহ শুরু হয় দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হওয়ার আট বছর পর এবং তা ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত নয় বছরের সময়সীমায় ব্যাপ্ত। পরিচালক আল-সায়্যিদ এখন একজন অসুস্থ বৃদ্ধ লোক। তিনি তার মুদী দোকানের ব্যবসা বিক্রি

করে ঘরে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন। তাঁর সব বন্ধুবান্ধব একের পর এক মারা যায়। সবশেষে তিনি পঙ্গু হয়ে নিঃসঙ্গ জীবন কাটান। ১৯৪১ সালে মিসরের উপর অক্ষ শক্তির বিমান হামলার সময় তিনি নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন এবং শেষ পর্যন্ত এই হামলায় নির্দয়ভাবে মারা যান। আমীনার বার্ধক্য কালও দুঃখে কাটে। তাঁর বড় ছেলের স্মৃতির চেয়ে আয়েশার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কম দুঃখজনক ছিল না। নাতিনী নাঈমা পরিবারের একমাত্র উজ্জ্বল ভরসা ছিলেন। তিনি মায়ের ন্যায় সুন্দরী ও প্রাণবন্ত ছিলেন। তিনি স্বাধীনতা ভোগ করলেও দাদা তাঁকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বিরত রাখেন। তিনি অতি ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও গান ও সঙ্গীতের বড় অনুরাগী ছিলেন। তখনো কামাল পিতা মাতার সাথে থাকেন। ত্রিশ বছর বয়সেও বিবাহ না করে তিনি আধ্যাত্মিক অনুভূতির উন্নতি সাধন করেন। ইংরেজীর একজন শিক্ষক হিসাবে তিনি পরিতৃপ্ত হননি এবং তাঁর সাহিত্য-পেশার কোন একটি স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়নি। এই সময় তিনি একটি সাহিত্য পত্রিকায় দর্শন শাস্ত্রের উপর মাসিক প্রবন্ধ ছাপতে থাকলেও তা সৃজনশীল ছিল না বলে অনুভব করেন। তাঁর প্রবন্ধগুলো প্রধানতঃ দর্শনের বিভিন্ন গতিধারার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ছিল। তাঁর মতে একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রীধারী ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত ভাল লিখতে পারেন। একই সাময়িকীতে ছোট গল্প লেখক রিয়াদ কালদাস নামক একজন মিসরীয় খ্রীস্টান যুবক-লেখকের সাথে তাঁর এই সময় পরিচয় ঘটে। তাঁদের উভয়ের বন্ধুত্ব তাঁদেরকে বুদ্ধিমত্তার অন্তরীণ থেকে মুক্তি দেয়। তবে কোন কিছুই তাঁদের নৈরাশ্য ও সংশয়ের অবসান ঘটাতে পারেনি। আয়িদা শাদ্দাদ ও তাঁর পরিবারের সাথে সকল সম্পর্ক কামাল ছিন্ন করেন অনেক আগেই, কিন্তু তিনি তাঁর প্রথম এবং একমাত্র প্রেমের কথা কখনো ভুলতে পারেন নি। আয়িদার ছোট বোন বদূর কায়রোর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী। একটি নিছক দুর্ঘটনার সময় তিনি বদূরের সাক্ষাৎ পান। তিনি বদূরকে তাঁর শৈশবেই চিনতেন। কামাল তাঁর প্রতি দুর্বল থাকলেও কখনো তা প্রকাশ করেননি। কিছুদিন পর বদূরের অন্যত্র বিবাহ হয়। কামালের প্রথম জীবনের এই অভ্যর্থনার প্রতিধ্বনি ধীরে ধীরে তাঁর জীবন থেকে দূরে সরে যায়। স্ত্রী যান্নুবার কল্যাণে চল্লিশ বছরের ইয়াসীনের অবস্থার

দেখতে পান। তিনি নীতিভ্রষ্টতার শিকার হয়েছেন বলে তার মনে হয়। এই দিকে ইয়াসীন পরিবারের মান মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতেই থাকেন। তিনি ফাহমীর পরিত্যক্তা স্ত্রী মরিয়মকে বিবাহ করেন। এতে আমীনা দুঃখিত হলে ইয়াসীন স্ত্রীসহ পিতার বাড়ী ত্যাগ করেন এবং কাস্‌র আল- শাওক এলাকায় নিজের বাড়ীতে বসবাস করতে থাকেন। কিছু দিন পর তিনি মরিয়মের আকর্ষণ ত্যাগ করে তাঁর পিতার প্রণয়িনী ও নিজের পুরাতন বান্ধবী গায়িকা যান্নুবাকে ঘরে তুলে নেন। মরিয়ম বিরক্ত হয়ে একরাত্রে ঘর থেকে বের হয়ে যান এবং ইয়াসীন ক্রোধ-বশতঃ তাঁকে পরিত্যাগ করেন। যান্নুবা তখন সম্পূর্ণরূপে ইয়াসীনের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন এবং একপর্যায়ে তাদের গোপনে বিবাহ হয়। ইয়াসীনের সর্বশেষ এই ভুলের খবর শুনে আল-সায়্যিদ তাঁকে তিরস্কার করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি। ইয়াসীনের প্রথম স্ত্রীর ছেলে রুদওয়ান জন্মগ্রহণ করলে তাকে তার নানা বাড়ীতে থাকতে দেন। অন্যদিকে খাদীজা ও আয়েশা একই ঘরে একই শাশুড়ীর কাছে থাকলেও তাঁদের সম্পর্ক ভিন্ন ধরনের ছিল। ছিমছাম এবং দাম্ভিক খাদীজা কখনো বৃদ্ধা শাশুড়ীর সাথে শান্তিতে ছিলেন না। ফলে একপর্যায়ে আল-সায়্যিদকে তাঁর উদ্ধত মেয়ের শাসনের জন্য ডাকা হয়। আব্‌দ আল-মুনিম ও আহমদ নামে খাদীজার দুই পুত্র সন্তান ছিল। বৌমা হিসাবে আয়েশা শাশুড়ীর নিকট খুব বিনয়ী ছিলেন। আয়েশার দুই ছেলে ও এক কন্যা ছিল। আয়েশার শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীনচেতা জীবনে একসময় সর্বনাশ নেমে আসে। তাঁর স্বামী ও দুই ছেলে হঠাৎ টাইফয়েড রোগে মারা যায়। আয়েশা তাঁর কন্যাকে নিয়ে মা বাবার কাছে চলে আসেন। উপন্যাসটি ১৯৫৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৪ সালে এর দ্বাদশ সংস্করণ বের হয়।

১৩. আল-মুক্কারিয়্যাহ (আল-মুক্কারিয়্যা এলাকা) : ত্রয়ী উপন্যাসের এই তৃতীয় ও শেষ খণ্ডের ঘটনা প্রবাহ শুরু হয় দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হওয়ার আট বছর পর এবং তা ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত নয় বছরের সময়সীমায় ব্যাপ্ত। পরিচালক আল-সায়্যিদ এখন একজন অসুস্থ বৃদ্ধ লোক। তিনি তার মুদী দোকানের ব্যবসা বিক্রি

কিছুটা পরিবর্তন হয়। ইয়াসীনের পরিবার যান্নুবাকে গ্রহণ করে নেয়। কিশোরী কারীমা তাঁদের একমাত্র কন্যা সন্তান। ইয়াসীনের প্রথম পক্ষের ছেলে রুদওয়ান এখন একজন সুদর্শন যুবক, যিনি পিতার সাথেই থাকেন। কলেজ জীবনে রুদওয়ান রাজনীতির আনকূল্যে ছিলেন এবং অতি-শীঘ্রই রাজনীতিতে সুনাম অর্জন করেন। সরকারের কছে তাঁর মর্যাদা নিজ পরিবারে তাঁকে একজন খ্যাতিমান সদস্য করে দেয়। তিনি তাঁর চাচাতো ভাইকে চাকুরী পেতে এবং তাঁর পিতার পদোন্নতির ব্যাপারে সাহায্য করেন। এমন কি তিনি কামালকে একটি প্রাদেশিক স্কুলে বদলী করার আদেশ বাতিল করান। এইদিকে আল-মুক্কারিয়্যা এলাকায় অবস্থিত খাদীজার দুই ছেলেও রাজনীতিতে সক্রিয়ভবে অংশগ্রহণ করেন। তবে তাঁরা রুদওয়ানের ন্যায় আদর্শ বিবর্জিত ছিলেন না। বড় ভাই 'আব্‌দ আল মুন্‌য়িম একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি মুসলিম ব্রাদারহুডে যোগ দেন এবং নতুন ইসলামী অন্দোলনের আদর্শে উন্নয়নের কাজে অবসর সময় ব্যয় করেন। তিনি সুদর্শন ছিলেন বলে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার আগেই খাদীজা তাঁর একমাত্র বোনঝি নাঈমার সাথে তাঁর বিবাহ দেন। এক বছর যেতে না যেতেই বিশ বছরের নাঈমা সন্তান প্রসবের সময় মারা যায়। মা আয়েশা মানসিক ভার-সাম্য প্রায় হারিয়ে ফেলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় প্রিয়জনের সাথে ঘুরে ফিরে কাটান। পরে আব্‌দ আল-মুন্‌য়িম মায়ের অমতেই ইয়াসীনের মেয়ে কারীমাকে বিবাহ করেন। তাঁর ছোট ভাই আহ্‌মদ সামাজিক সুবিচারের সাথে প্রাথমিক জীবনেই জড়িত হন।উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি বামপন্থী জার্নাল "আল-ইনসান আল-জাদীদ" (নতুন মানুষ)-এর একজন উৎসাহী পাঠক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তিনি এই পত্রিকায় লিখতে থাকেন। এক ধনী পরিবারের এক ছাত্রীর সাথে ব্যর্থ প্রেম তাঁকে বুর্জোয়াদের অবমূল্যায়নে আরো প্ররোচিত করে। স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর তিনি একই জার্নালের স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে যোগ দেন। এখানো তিনি সাওসান নামী এক পুরাতন মহিলা স্টাফের প্রেমে আবদ্ধ হন এবং তাকে বিবাহ করেন। ফলে আল-সুক্কারিয়্যাহর বাড়ী পরস্পরবিরোধী কার্যকলাপে দ্বিধাবিভক্ত একটি জনাকীর্ণ স্থানে পরিণত হয়। সবশেষে আব্‌দ আল-মুনয়িম ও আহ্‌মদ পুলিশের হাতে বন্দী হন। কামাল তখনো সংশয়বাদ ও বন্ধ্যাত্ব

থেকে মুক্তির কোন পথ খোঁজে পাননি। আল-সুক্কারিয়্যার বাড়ীতে খাদীজা ও ইয়াসীনের সন্তানেরা জন্ম নিতে থাকে। বাইন আল-কাসরাইন হাউজে আমীনা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রয়েছেন এবং হয়ত শীঘ্র মারা যাবেন। উপন্যাসটি প্রথম ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং এর একাদশ সংস্করণ ১৯৮৪ সালে আত্মপ্রকাশ করে। ত্রয়ী উপন্যাসে নাজীব ১৯১৯ সালে মিসরের বিপ্লব থেকে শুরু করে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল সিদকী, মাহমুদ আল-নাকরাশী, পাশা ও মুস্তফা আল-নাহ্যাসের আমলে সংঘটিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরেন।

১৪. আওলাদ হারাতিনা (অমাদের এলাকার ছেলেমেয়েরা): পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই রূপক উপন্যাসটির প্রতিটি অধ্যায়ে জবালাভী নামক একজন সাধারণ পূর্বপুরুষের বংশধরধের বিভিন্ন প্রজন্মের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কাহিনীটির প্লট ইসলাম, খ্রীস্টান ও ইহুদী ধর্মের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট ঘটনাবলীর আলোকে উপস্থাপিত। কয়েকটি চরিত্রের নামের উচ্চারণ ও বানানগত সাদৃশ্য ঐতিহাসিক চরিত্রের আদিরূপকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন আদহাম শব্দটি আদমকে, জাবাল (পাহাড়) শব্দটি সম্ভবতঃ সিনাই পর্বত অথবা হযরত মূসা (আঃ) কে স্মরণ করিয়ে দেয়। রিফা'আ (উর্ধ্বে উঠানো) হযরত ঈসা (আঃ) কে আকাশে উঠানো এবং আরাফাত (জানা) বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। উপন্যাসটি সমসাময়িক ব্যক্তি-চরিত্রের একটি প্রতিবেদন তুলে ধরেছে। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু হলো, মানব জাতিকে পাপাচার ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তিনজন মহানবী পাঠিয়েছেন। প্রথম হলেন জাবাল অর্থাৎ মূসা (আঃ), দ্বিতীয় হলেন রিফা'আ অর্থাৎ ঈসা (আঃ) এবং সর্বশেষ হলেন কাসিম অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ)। তাঁদের পর যাদুকর আরাফাত অর্থাৎ বিজ্ঞানের আগমন ঘটে। তবে তা মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়নি। বৃহৎশক্তিগুলো বিজ্ঞানের সাহায্যে আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরী করে। তবে একমাত্র ধর্মই সর্বযুগে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে কাজ করে। আধুনিক মিসরীয় জীবনের চরিত্র থেকে উপন্যাসটির ভাবধারা গৃহীত। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে ১৯৫৯ সালে প্রথমে "আল-আহ্রাম" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৯৬৭ সালে বৈরুত থেকে গ্রন্থাকারে ছাপানো হয়।

১৫. আল-লিস্য ওয়া আল-কিলাব (চোর ও কুকুর): এটা নাজীবের একটি সামাজিক উপন্যাস। আকারে ছোট কিন্তু বিষয়বস্তুতে উপন্যাসটি মূল্যবান। ১৯৬১ সালে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এর নবম সংস্করণ বের হয় ১৯৮০ সালে। উপন্যাসটিতে মায়ীদ মুহ্‌রান নামে ভদ্রবেশী একজন কুখ্যাত চোরের চরিত্র অংকন করা হয়েছে। চুরির অপরাধে তাঁকে চার বছর কারাবরণ করতে হয়। তাঁর স্ত্রী নাবাবিয়্যাহ তাঁকে ত্যাগ করেন এবং তাঁর প্রাক্তন সহকারী ইল্লিশকে বিবাহ ক'রে তাঁর গীজার বাড়ীতে বসবাস করতে থাকেন। কারামুক্ত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সাঈদ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কারণ ইল্লিশ তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে বিবাহ করার জন্য মুহ্‌রানাকে পুলিশের হাতে ইতিপূর্বে ন্যস্ত করেছিলেন। সাঈদ প্রথমে তাঁর পাঁচ বছরের কন্যা সানা' কে ফিরিয়ে আনার জন্য যান, কিন্তু কন্যা তাঁকে চিনতে পারেনি। তিনি তাঁর মরহুম পিতার আধ্যাত্মিক শিক্ষক আলী আল-জোনাইদীর নিকট আশ্রয় নেন। পরে তিনি বামপন্থী সাংবাদিক রউফ ইলওয়ানের কাছ সমাজতন্ত্রের প্রশিক্ষণ নেন। পরে তিনি একটি গাড়ী ও একটি পিস্তল নিয়ে ইল্লিশের বাড়ী আক্রমণ করেন। কিন্তু বাড়ীতে ইল্লিশ ও তাঁর স্ত্রী না থাকায় প্রহরী তার গুলিতে মারা যায়। রউফের পত্রিকা হত্যাকারীর বিরুদ্ধে লিখতে থাকলে সাঈদ তখন নূর নামী এক পতিতার কাছে আশ্রয় নেন এবং সেখানে পুলিশ তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

১৬. আল-সুম্মান ওয়া আল-খারীফ (কোকিল ও হেমন্ত): এই সামাজিক উপন্যাসটি ১৯৬২ সালে কায়রো থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এর অষ্টম সংস্করণ ১৯৮৪ সালে বের হয়। উপন্যাসটির যুবক-নায়ক ঈসা আল-দাব্বাগ একজন উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরে ছিলেন। তিনি ১৯৫২ সালে ২৬শে জানুয়ারীর "কালো শনিবারে" নীলনদ এলাকায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত কমিশনের কাজ শেষ করে কায়রোতে ফিরে আসেন। তিনি ওয়াফ্‌দ পার্টির পক্ষে কাজ করতেন। পরিস্থিতির বিপর্যয় ঘটলে ওয়াফ্‌দ পার্টি সরকারেরও পতন ঘটে এবং তাঁর পদাবনতি ঘটানো হয়। তবে তিনি পার্টির মাধ্যমে তাঁর ভাগ্যকে প্রসন্ন করতে চেষ্টা করেন। এরই মধ্যে তিনি একজন প্রখ্যাত জজ এবং রাজার আশ্রিত ব্যক্তির কন্যা সালওয়াকে পরবর্তী আগস্ট মাসে বিবাহ করার

দিন ধার্য করেন। ১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই তারিখে তরুণ অফিসাররা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মিসরের ক্ষমতা হাতে নেন। ওয়াফ্‌দ পার্টি নতুন শাসকদের প্রশাসনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ ছিল। তা সত্ত্বেও ওয়াফ্‌দ পার্টির সদস্যদেরকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হতো না এবং তাদের দেশপ্রেমের কথাও স্মরণ করা হতোনা। অধিকন্তু একটি তদন্ত কমিটি ঈসাকে পক্ষপাতিত্ব ও ঘুষের দায়ে অভিযুক্ত করে। পরিণামে তিনি চাকুরীচ্যুত হন এবং তাঁর বাগদত্তা সালওয়ার পরিবার তাঁর সাথে সালওয়াকে বিবাহ দিতে জটিলতার সৃষ্টি করে। ঈসার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। চাকুরীর কোন সন্ধান না পেয়ে তিনি কয়েক মাস পর কায়রো ত্যাগ করে আলেকজান্দ্রিয়ায় চলে যান। মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি পুনরায় কায়রোতে ফিরে আসেন এবং ফিরে এসে দেখেন যে তাঁর চাচাত ভাই হাসান সালওয়াকে বিবাহ করেছেন। তিনি হাসানের প্রতি ক্ষিপ্ত হন এবং হাসানের নতুন সরকারের প্রতি তাঁর আস্থাহীনতা বেড়ে যায়। তিনি তাঁর মার বাড়ীটি বিক্রি করে দেন। এই সময় সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে ইংরেজ, ফরাসী ও ইসরাইলী বাহিনী মিসরের উপর আক্রমণ করলে ঈসার দেশপ্রেম আবার জেগে উঠে। স্বল্প দিনের যুদ্ধ শেষে ঈসার নৈরাশ্য আরো বেড়ে যায়। তিনি "রাহ্‌ আল-বারর" সমুদ্র সৈকতে জুয়া খেলে ও মদ্য পান করে সময় কাটান। পরে তিনি তাঁর মধ্যবয়সী স্ত্রী কাদরিয়্যাকে নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার সৈকতে চলে যান। সেখানে তাঁর পরিত্যক্তা স্ত্রী রীরী ও তাঁর কন্যার সাথে দেখা হয়। তবে তাদের মধ্যে ভাবের কোন আদান প্রদান সম্ভব হয়নি। উপন্যাসটির শেষ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে ঈসা এক অন্ধকার রাতে সা'আদ যগলূলের ভাস্কর্যের নীচে বসে আছেন। এমন সময় একজন অতি পরিচিত বিপ্লবী যুবক তাঁকে বন্ধুসুলভ আচরণে সম্বোধন করেন। ঈসার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে যুবকটি চলে যান। কিন্তু ঈসা পরক্ষণে তাঁর পিছু পিছু গমন করেন। ততক্ষণে যুবক অনেক দূর চলে গেছেন।

১৭. দুনি আল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র পৃথিবী): এটা নাজীবের একটি ছোট-গল্প সংকলন যা ১৯৬২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬১। গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণ ১৯৭৮ সালে বের হয়। এর একটি

ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছেন চাপরাশি ইব্রাহীম চাচা। তিনি অফিস স্টাফের মাসিক বেতন নিয়ে আবুকিরের সমুদ্র সৈকতে পালিয়ে যান। অনেক খোঁজ খবরের পর গুপ্তচর বিভাগ তাঁকে আবু লা-আব্বাস মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় গ্রেপ্তার করে। তিনি বলেন এটাই হলো আল্লাহ্‌র পৃথিবী।

১৮. আল-তারীক (পথ ও পথিক): এই সামাজিক উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে এবং অষ্টম সংস্করণ বের হয় ১৯৮৪-তে। উপন্যাসটির নায়ক সাবির আলেকজান্দ্রিয়ার একজন সুদর্শন যুবক ছিলেন। সাবিরের বাবার পরিচয় অজ্ঞাত, মা গুপ্ত আড্ডার একজন প্রাক্তন পরিচালিকা—যিনি পাঁচ বছর কারাবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর ছেলে সাবিরকে বলে যান যে, কায়রোর একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তি সৈয়দ আল-রহীমী তার পিতা ছিলেন। সাহায্যের জন্য পিতাকে খোঁজে বের করার জন্য সাবিরকে মা অনুরোধ করেন। পিতার খোঁজে সাবির কায়রোর উদ্দেশ্যে আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করেন। তিনি সেখানে একটি হোটেল ভাড়া করেন কিন্তু পিতার খোঁজ না পেয়ে দুর্বল ও নিরাশ হয়ে পড়েন। তিনি প্রথমে কারীমার প্রেমে পড়েন এবং পরে ইলহামের প্রেমে। কারীমা বয়স্ক হোটেল-মালিকের যুবতী স্ত্রী ছিলেন। সাবিরের সাথে কারীমা গোপনে রাত কাটাতেন। জ্ঞানবতী ও কুৎসিত ইলহাম একটি পত্রিকা অফিসের সেক্রেটারী ছিলেন। পিতার কোন সন্ধান না পেয়ে সাবির অর্থাভাবে পড়েন এবং কারীমার স্বামীকে হত্যা করার চক্রান্তে জড়িত হয়ে হোটেলের আয়ের অংশীদার হতে চান। হত্যাকান্ডের তদন্ত চলাকালে পুলিশ হোটেলের চাকরকে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করে। কারীমা তাঁর মায়ের কাছে হোটেলেই থাকেন এবং সাবিরের সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হন। এইদিকে মৃত স্বামীর সহকারী মুহাম্মদ আলসাভী কারীমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিলে একরাতে সাবির গোপনে কারীমার কাছে হোটেলে আসেন এবং কারীমার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনেন। কারীমা তা অস্বীকার করেন এবং সাবিরের প্রতি তাঁর ভালবাসা পুনরায় ব্যক্ত করেন। ততক্ষণে পুলিশ খবর পেয়ে সাবিরকে গ্রেপ্তার করে। আল-সাভীর উত্থাপিত অপবাদ সাবিরের নিকট মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সাবির দুইটি হত্যার

আসামী। এই দিকে সাবিরের প্রেমিকা ইলহাম নিরব না থেকে কৌশলী নিয়োগ করেন এবং সাবিরের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। কৌশলী সাবিরের কাছে তার পিতার আসল পরিচয় ব্যক্ত করেন, তবে তাঁর বর্তমান ঠিকানা অজানাই থাকে। মামলার রায় অনুসারে সাবিরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তবে কোর্টে আপিল করা হলে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে আজীবন কারাবরণের শাস্তি দেয়া হতে পারে।

১৯. বায়ত সায়্যিয়ী আল-সুম'আ (একটি কলঙ্কিত ঘর): নাজীবের অন্য আর একটি ছোটগল্প সংকলন, যা ১৯৬৫ সালে কায়রোর মাকতাবা-মিস্‌র থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর সপ্তম সংস্করণ ১৯৮৩ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

২০. আল-শাহ্‌হায (ভিক্ষুক): সামাজিক উপন্যাসটির নায়ক উমর আল-হামযাভী কায়রোর একজন সফল আইনজীবী ছিলেন। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী হামযাভী যয়নবকে বিবাহ করেন এবং দুই কন্যা ও এক পুত্রের পিতা হন। ১৯৬০ এর দশক উপন্যাসটির ঘটনাকাল। প্রথম জীবনে উমর সমাজতান্ত্রিক কবিতার প্রতি অধিক আগ্রহী ছিলেন। মধ্যম-জীবনে তিনি নির্জনতা, আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা ও প্রাচ্যের সূফী কবিতায় বেশী আনন্দ পেতেন। আইন পেশায় তিনি যথেষ্ট সম্পদ অর্জন করেন। এক সময় হঠাৎ শ্রান্ত হয়ে যান এবং জীবনকে উপভোগ করতে ব্যর্থ হন। তবে ডাক্তার তাঁর মধ্যে কোন রোগ দেখতে না পেয়ে তাঁকে কাজকর্ম ছেড়ে ব্যায়াম করতে পরামর্শ দেন। এক সময় উমর ছুটির দিনে পরিবারের লোকদেরকে নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার সৈকতে বেড়াতে যান এবং সেখানে তিনি দৈহিক শক্তি ফিরে পান। একদিন তাঁর বন্ধু প্রখ্যাত বেতার-শিল্পী মুস্তফা আল-মীনাভীর সাথে তিনি নাইট ক্লাবে যান এবং সেখানে রেস্তোরাঁর নৃত্য-শিল্পী ওয়ারদার প্রেমে আবদ্ধ হন। তিনি ওয়ারদাকে নিয়ে একটি নতুন বাড়ীতে বসবাস করতে থাকেন এবং এক সময় তাকেও ত্যাগ করেন। এরপর তিনি মার্গারেটের কাছে যান এবং শেষে মুনার কাছে। অতঃপর তিনি সব কিছু ত্যাগ করে নির্জন জীবন কাটাতে থাকেন। এই সময় তাঁর এক আইনজীবী বন্ধু উসমান খলীল বিশ বছর জেল খেটে ছাড়া পান। তিনি একজন বিপ্লবী হলেও বর্তমান মিসর সরকারকে মেনে নেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লবের আদর্শ ত্যাগ করে বিত্তশালী হন। এক সময় তিনি উমরের স্কুলগামী কন্যা বুছাইনাকে বিবাহ করেন। পুরাতন বিপ্লবী উসমান গোপনীয়তা ভঙ্গ করলে পুলিশ তাঁকে খুঁজতে থাকে। তিনি উমরের কাছে আশ্রয় নিতে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় পুলিশ তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে এবং তাতে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হন। উভয়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কিন্তু উমর তখনও অচেতন অবস্থায় ছিলেন। উপন্যাসটি ১৯৬৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮২ সালে এর সপ্তম সংস্করণ বের হয়।

২১. সারসারা ফাওক আল-নীল (নীল নদের পিঠে খোশ গল্প): এই সামাজিক উপন্যাসটি প্রথম ১৯৬৬ সালে কায়রোর মাকাত্যবা মিস্‌র থেকে প্রকাশিত হয়। এর ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৮২ সালে আত্মপ্রকাশ করে। ষাটের দশকে নাজীব মাহ্‌ফূয যে কয়টি উপন্যাস লেখেন এটা তাদের মধ্যে অন্যতম। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে একই বছর "আল-আহ্‌রাম" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ছোট এই উপন্যাসটির প্রধান বৈশিষ্ট্য বাস্তবতা। যদিও আধ্যাত্মিকতার প্রতি ইঙ্গিতও পরিলক্ষিত। উপন্যাসটির কাঠামো ১৯৬৪ সালে কায়রোর নীল নদের উপর একটি নৌকার ঘরে (আওয়্যামা) তৈরী করা হয়। সারসারা-এর প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছেন মধ্যম বয়সী মাদকা-সক্ত আনীস, যিনি নৌকা ঘরের মালিক এবং নিম্নপদস্থ একজন সরকারী চাকুরেও বটে। অন্যান্য মাদকাসক্ত সদস্যের মধ্যে সিনেমা নায়ক, আইনজীবী, সাংবাদিক এবং লেখকও ছিলেন। আনীস বিপত্নীক ও নিঃসন্তান ছিলন। তিনি অফিসের সময় ছাড়া বাকী সময় নৌকা ঘরেই কাটাতেন। তিনি ইতিহাস ও সূফীবাদে পারদর্শী ছিলেন। সমাজবিরোধী চরিত্রের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সামাররা বাহজাত নামী এমজন যুবতী সাংবাদিক প্রস্তাবিত একটি নাটকের প্লট তৈরীর জন্য নৌকা ঘরে প্রায় আসতেন। তিনি আদর্শবাদী সাংবাদিক ছিলেন এবং মাদকাসক্ত ছিলেন না। একদিন হিজরী উৎসব উপলক্ষে নয় সদস্যের একটি দল খোলা আকাশের নীচে গাড়ী চালিয়ে বেড়ায়। দলটি সাক্কারার উদ্দেশ্যে গাড়ী চালায়। রজব এক সময় সাম্মারার কাছে প্রেম নিবেদন ক'রে কোন সাড়া পাননি। ফিরার পথে রজব বেপরোয়া

গাড়ী চালিয়ে একজন পথযাত্রীকে হত্যা করেন। সাম্মারা সহ অন্যান্য সকলেই দুর্ঘটনার কথা পুলিশকে জানানো থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। এইদিকে আনীস তাঁর অফিসের উর্ধ্বতন কর্মচারীর সাথে অশোভন আচরণ করে চাকুরীচ্যুত হন। বিকালে সব বন্ধু নৌকা ঘরে একত্রিত হলে আনীস দুর্ঘটনার কথা পুলিশকে জানানোর পক্ষে মত দেন। ফলে রজবের সাথে আনীসের তর্কযুদ্ধ শুরু হয় এবং রজব আনীসকে হত্যা করার হুমকিও দেন। এক পর্যায়ে রজব নিজেই আনীস ও সাম্মারাকে নৌকায় রেখে পুলিশকে সংবাদ দিতে দ্রুতগতিতে বের হয়ে যান। তাঁর সাথে অন্যান্য সদস্যও যান। আনীস রজবের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। কিন্তু সাম্মারার সাথে প্রেমের আদান প্রদানের আগেই আনীস মাদকদ্রব্য সেবন করে অচেতন হয়ে যান।

২২. মীরামার (একটি পান্থশালা) : ১৯৬৭ সালে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৭৯ সালে এর পঞ্চম সংস্করণ বের হয়। মীরামার আলেকজান্দ্রিয়ার একটি ছোট্ট পান্থশালার নাম। ষাট দশকের মাঝামাঝি সময় সেখানে উপন্যাসটির কাহিনী সংঘটিত হয়। মরিয়ানা নামে প্রায় ষাট বছরের এক গ্রীক মহিলা মীরামার পান্থশালার মালিক ছিলেন। অতীতের ন্যায় তাঁর ব্যবসা তেমন জমে ওঠেনি। উপন্যাসটির অন্য চরিত্র আশি বছরের 'আমির ওয়াজদী' নামে একজন অবসর প্রাপ্ত সাংবাদিক –যিনি বহু বছর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার পরও জনগণের কাছে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও ঘৃণিত দেখতে পান। তিনি অবশিষ্ট জীবন আলেকজান্দ্রিয়ার পান্থশালায় কাটাতে আসেন। অতীতে তিনি একজন সাহসী, বিদ্রোহী এবং প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী ছিলেন। তবে বর্তমানে তিনি পবিত্র কোরআনের আয়াতের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছেন। শিল্প মন্ত্রণনালয়ে কর্মরত সারহান আল-বুহাইরী নামে প্রায় ত্রিশ বছরের একজন হিসাব-রক্ষক বর্তমানে ক্ষমতাসীন পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য। তিনি মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ান। তবে অন্তরে তিনি ধনী হওয়ার ও সহজ জীবন যাপনের কামনা করেন। যুবক মানসূর বাহী একজন বেতার-শিল্পী। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের একজন সমাজবাদীও ছিলেন। বড় ভাই পুলিশ অফিসারের চাপে তিনি বর্তমানে তাঁর কমরেড-দেরকে ত্যাগ করেন। এক বন্দী-কমরেডের স্ত্রী দুররিয়ার সাথে তাঁ

গোপন সম্পর্ক ছিল। স্বামীকে ত্যাগ করার প্ররোচনা দিয়ে তিনি দুর্‌রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি প্রতারণার দ্বারা আবিষ্ট হন যা প্রতিনিয়ত তাঁর অন্তরকে পীড়া দেয়। হোসনী আল্লাম এক সামন্তবাদী পরিবারের একজন আনন্দবাদী দার্শনিক যুবক। মিসরের "মহাপ্লাবনের আগে" তিনি লাগামহীনভাবে অর্থব্যয়ে করার উদ্দেশ্যে আলেকজান্দ্রিয়া আসেন। তুল্‌বা মারযূক রাজকীয় সরকারের একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা। তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তিনি তিক্ত বিদ্বেষ পরায়ণ এবং বিগত দিনের বিস্ময়কর প্রতিশোধের স্বপ্নের মাধ্যমে উক্ত সরকারের চরদের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক সজাগ দৃষ্টি রাখছেন। যাহ্‌রা একজন গ্রাম্যযুবতী। একজন বৃদ্ধ বলপূর্বক তাকে বিবাহ করতে চাইলে সে আলেকজান্দ্রিয়ায় পালিয়ে আসে। মীরামার পান্থশালার একজন পরিচারিকা হিসাবে চাকুরীতে নিয়োগ পায়। তার সৌন্দর্য পান্থশালার লোকদের মুগ্ধ করে এবং প্রকৃত অর্থে সে হলো উপন্যাসটিতে মনোযোগের-কেন্দ্রবিন্দু। এইদিকে সারহান মীরামারে এসে যাহ্‌রার প্রেমে আবদ্ধ হন। পরে তারা বিয়ের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু সারহান যাহরাকে বিবাহ করতে পরে অস্বীকৃতি যানান। কিছুদিন পর সারহানকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। যাহ্‌রার সাথে প্রতারণা করার জন্য মানসূর হত্যা করেছেন বলে দাবী করেন। তবে পুলিশের তদন্তের দ্বারা বুঝা যায় যে, সারহানা চোরাচালানীর কারবারে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করেন। ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে মরিয়ানা তাৎক্ষণিকভাবে যাহ্‌রাকে পান্থশালার চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেন। উপন্যাসটি মীরামার পান্থশালার চারজন আবাসিক সদস্যের দেয়া ব্যক্তিগত প্রামাণিক রূপে লেখা হয়। উপন্যাসটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রতিটি উত্তম পুরুষে লেখা। বক্তাগণ হলেন আমীর, হোসনী, মানসূর এবং সারহান। তুলনামূলক ভাবে ছোট পঞ্চম অধ্যায়ে আমীরের দৈব কণ্ঠ পুনরায় ফিরে আসে। উপন্যাসটিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুগুলো স্থান পেয়েছে।

২৩. খাম্মারাত আল-কিত্ত আল-আসওয়াদ (কাল বিড়ালের সরাইখানা): এই ছোটগল্প সংকলনটি প্রথম ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং এর সপ্তম সংস্করণ ১৯৮৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে। মূলতঃ ছোটগল্প সংকলনটিতে আমরা লেখকের ষাটের দশকের গোড়ার দিকের লেখার পরিবেশ ও টেকনিকের পরিচয় পাই। তবে এই সংকলনের

কোন কোন ছোটগল্পে আমরা প্রচলিত যুক্তিবিদ্যার বিপরীত বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই। তাছাড়া বাস্তবতা ও ভয়াবহ স্বপ্নের মধ্যে এখানে সন্দেহ প্রায়শ বিরাজমান ; যেমন, ছোটগল্প "ফিরদাউস" এবং ছোটগল্প "আল-মাসতুল ওয়া আল-কুনবুলা"।

২৪. তাহত্ আল-মিযাল্লাহ্ (শামিয়ানার নীচে) : এই ছোটগল্প সংকলনটি প্রথম ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৪ সালে এর ষষ্ঠ সংস্করণ বের হয়। একটি বৈচিত্র্যময় পৃথিবী এই সংকলনে চিত্রায়িত করা হয়, যার বাসিন্দারা আশে-পাশের ঘটনাবলী সম্পর্কে খুব কমই জানতে পারে।

২৫. হিকায়াত বিলা বিদায়াত ওয়া নিহায়াত (সূচনা ও সমাপ্তিবিহীন একটি গল্প) : ছোটগল্প সংকলনটি প্রথম ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয় এবং এর ৭ম সংস্করণ ১৯৮৭ সালে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে সংলাপের প্রাধান্য রয়েছে। সংকলনটির ছোটগল্পগুলোতে রাজনৈতিক বিষয়ের প্রতি বাহ্যত ইঙ্গিত না থাকলেও কৌশলে চলতি রাজনীতির উপর তীব্র পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে।

২৬. শাহ্র আল-আস্ল (মধুচন্দ্রিমা) : ছোটগল্প সংকলনটি প্রথম ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয় এবং এর ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৮২ সালে বের হয়। এর প্রতিটি গল্পে সংলাপের প্রাধান্য রয়েছে। এখানে সারিবদ্ধ ও রূপক অর্থযুক্ত ছোট ছোট দৃশ্য রয়েছে।

২৭. আল-মারায়া (দর্পণ) : ১৯৭২ সালে নাজীবের এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮০ সালে এর সপ্তম সংস্করণ বের হয়। উপন্যাসটিতে ধারাবাহিক ভাবে পঞ্চান্নটি অধ্যায় রয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে এমন ভিন্ন ধরনের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে যা বর্ণনাকারী তাঁর জীবনে সাক্ষাৎ করেছেন। এইসব চরিত্রের নাম কল্পিত, তবে নিঃসন্দেহে অধ্যায়গুলো প্রকৃত লোকদেরকেই চিত্রিত করেছে। এর পরও এখানে ঘটনা প্রবাহ কেন্দ্রস্থিত নয়। উপন্যাসটি অনেকাংশে আত্ম-জৈবনিক।

২৮. আল-হব্ব তাহ্ত আল-মাত্তার (বৃষ্টির নীচে ভালবাসা) : উপ-ন্যাসটি প্রথম ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮০ সালে এর ৪র্থ সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করে।

২৯. আল-জারীমা (অপরাধ) : একটি ছোটগল্প সংকলন, যা প্রথম ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং এর ৫ম সংস্করণ ১৯৮৪ সালে বের হয়।

৩০. আল-কারনাক (কারনাক) : কারনাক একটি বিতর্কিত উপন্যাস। এটি ১৯৭৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৭ সালে এর ৭ম সংস্করণ বের হয়। উপন্যাসটিকে ভিত্তি করে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জামাল আব্‌দ আল-নাসির-বিরোধী একটি ছায়াছবি তৈরি করা হয়।

৩১. কালব আল্‌-লাইল (রাতের হৃদয়) : উপন্যাসটি ১৯৭৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮১ সালে এর ৩য় সংস্করণ বের হয়।

৩২. হদরত আল-মুহ্‌তারাম (মাননীয় ব্যক্তির সামনে) : উপন্যাসটি ১৯৭৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৩ সালে এর ৪র্থ সংস্করণ বের হয়।

৩৩. মালহামাত আল-হারাফীশ (হারাফীসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ) : উপন্যাসটি ১৯৭৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এর ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

৩৪. আল-হব্‌ব ফাওকা হাদ্‌বাত আল-হারাম (পিরামিডের চূড়ায় ভালবাসা) : ছোটগল্প সংকলনটি ১৯৭৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এর ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮৭ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

৩৫. আল-শায়তানু ইয়ায়িযু (শয়তানের উপদেশ) : ছোটগল্প সংকলনটি প্রথম ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। এর ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮৭ সালে বের হয়।

৩৬. হিকায়তু হারাতিনা (আমাদের এলাকার কাহিনী) : উপন্যাসটি প্রথম ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয় এবং এর ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৮৬ সালে বের হয়।

৩৭. আস্‌র আল হব্‌ব (ভালবাসার যুগ) : উপন্যাসটি প্রথম ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয় এবং এর সর্বশেষ সংস্করণ ১৯৮৭ সালে বের হয়।

৩৮. আফরাহ্‌ আল-কুব্বাহ্‌ (গম্বুজের আনন্দ) : উপন্যাসটি ১৯৮১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এর ৩য় সংস্করণ ১৯৮৭ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

৩৯. লায়লাহ্‌ মিন লায়ালী আল্‌ফ লায়লা (হাজার রাতের এক রজনী) : উপন্যাসটি ১৯৮২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৭ সালে এর ৩য় সংস্করণ প্রকাশ পায়।

৪০. রা' আইতু ফীমা ইয়ারা আল-নাইম (ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায় দেখেছি) : ছোটগল্প সংকলনটি ১৯৮২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৭ সালে এর ৩য় সংস্করণ বের হয়।

৪১. আল-বাকী মিন আল-যামান সা'আতুন (সময়ের এক ঘণ্টা বাকী) : উপন্যাসটি ১৯৮২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এর ২য় সংস্করণ ১৯৮৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

৪২. আমাম আল-'আরশ' (সিংহাসন অভিমুখে) : উপন্যাসটি ১৯৮৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ২য় সংস্করণ ১৯৮৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

৪৩. রিহলা ইব্ন ফাতূমার ইব্নে ফাতূমার (ভ্রমণ): এই উপন্যাসটি ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৪৪. আল-তানযীম আল-সির্‌রী (গোপন সংগঠন) : ছোটগল্প সংকলনটি ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৪৫. আল-আইশ ফী আল-হাকীকাহ্‌ (বাস্তব জীবন ধারী) : উপন্যাসটি ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৪৬. ইয়াওম মাকতাল আল-যাইম (নেতা হত্যার দিন) : উপন্যাসটি ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৪৭. হাদীস আল-সাবাহ্‌ ওয়া আল-মাসা (সকাল সন্ধ্যার সংকল্প) : উপন্যাসটি ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়।

৪৮. সাবাহ আল-ওয়ারদ (গোলাপের সকাল) : ছোটগল্প সংকলনটি ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়।

৪৯. কাশতমার্‌ উপন্যাসটি যন্ত্রস্থ আছে।

৫০. আল-ফজ্‌র আল-কাযিব (মিথ্যা সকাল) : ছোটগল্প সংকলনটি ছাপানোর অপেক্ষায় আছে।

৫১. আয়্যুব : উপন্যাসটিকে ১৯৮৩ সালে চলচ্চিত্রে রূপ দেয়া হয়। এর কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন মিসরের প্রখ্যাত অভিনেতা উমর শরীফ। উপন্যাসটি ১৯৮৩ সালেই প্রকাশিত হয়।

তথ্যনির্দেশ

১ মূলতঃ "কালীলা ওয়া দিমনা" বইটি সংস্কৃতে (Karataka, damanka) লেখা ভারতীয় উপকথা। সংস্কৃত থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই উপকথা পহলভী ভাষায় Pilpay সংস্কৃত Hitopadesa এবং

Panchatantra-এর ভিত্তিতে অনুবাদ করেন। পরে পহলভী ভাষা থেকেই ইব্‌ন আল-মুকাফ্‌ফা আরবীতে তা রূপান্তর করেন। ভারতীয় উপকথার পশু-পাখী কেন্দ্রিক বিচিত্র ধরনের কাহিনীই হলো 'কালীলা ওয়া দিমনা'-এর বিষয়বস্তু। দ্র. F. Stengass, *A Comprehensive Persian–English Dictionary* (New Delhi : Munshiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1981), পৃ. ১০৪৬

২ দ্র. আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সাহিত্য (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৬৪), পৃ. ১২২-৩৪

৩ দ্র. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, "মিসরে আরবী সাংবাদিকতা সাহিত্যের বিকাশ", সাহিত্য পত্রিকা, বত্রিশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃ. ৭৩-৯৬

৪ দ্র. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক ; "নাজীব মাহ্‌ফূয : জীবন ও সাহিত্য", দৈনিক সংগ্রাম, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৮৮, পৃ. ৪–৬ ; ঐ, "নাজীব মাহ্‌ফূয : জীবন ও সাহিত্য", দৈনিক সংগ্রাম, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৮৮, পৃ. ৫ ; নাজীব মাহ্‌ফূয, মিদাক্ব এ্যালী, Trevor Le Gassick কর্তৃক অনূদিত (Washington DC : Three Continents Press, 1980), পৃ. iii–ix.

৫ মূলতঃ পুস্তকটি "Peeps at Many Lands" সিরিজে ছাপানো হয়। দ্র. Sasson Somekh, *The Changing Rhythm* (Leiden : E.J. Brill, 1973), পৃ. ৪২, n.1.

৬ দ্র. Hamdi al-Sakkut and Marsdon Jones ; "উদাবা মিস্‌র ফী আল-কার্‌ন আল-ইশরীন : নাজীব মাহ্‌ফূয", সাবাহ্‌ আল-খায়র, সউদী আরব (১৯৮৮), সংখ্যা–১৭১১, পৃ. ৬-১৮ (প্রবন্ধটি মূলতঃ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে "আল-জাদীদ" সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়)।

৭ দ্র. প্রাগুক্ত

৮ দ্র. Sasson Somekh, *The Changiug Rhythm*, পৃ. ৩৫-৫৯ ; J. Brugmam *An Introduction To The History of Modern Arabic Leterature in Egypt* (Leiden : E. J. Brill, 1984), পৃ. ২৯৩-৩০৫

৯ দ্র. প্রাগুক্ত

১০ দ্র. প্রাগুক্ত

১১ দ্র. S. Somekh: *The Changing Rhythm*, পৃ. ৪৮ ও n. 3.

১২ দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৫৯

১৩ দ্র. প্রাগুক্ত

১৪ দ্র. প্রাগুক্ত ; খালিদ জাদ্দ, "আল রিওআয়া আল-আরবিয়্যাহ্ তাফ্যু বিজায়িযা নোবেল", মাজাল্লাহ্ ইকরা, সঊদী আরব (১৪০৯ হি.), ১০ই রবীউল আওয়াল, সংখ্যা-৬৯, পৃ. ২৭-২৮

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৫৯

১৬ দ্র. "সাবাহ আল-খায়র", পৃ. ৬-১৮

১৭ দ্র. মুহাম্মাদ ইউসুফ কোকন, আলাম আল-নস্‌র ওয়া আল-শি'র্‌ফী আল-'আসর আল-আরাবী আল-হাদীস, (মাদরাজ : হাফিযা হাউজ, ১৯৮৪), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২০-৩০ ; S. Somekh, *The Changing Rhythm*, পৃ. ২০০-২৮ ; J. Brugman ; *An Introduction to The History of Modern Arabic Literature in Egypt*, পৃ. ২৯৩-৩০৫ ; মাজাল্লাহ ইকরা আল-সাউদীয়াহ্, পৃ. ২৭-২৮ ; *Midaq Alley*, Trans. (Washington D.C. : Three Continents Press, 1980), পৃ. iii–ix.